মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের দার্শনিক গুরুত্বের অনুসন্ধান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রে

এম.ফিল. উপাধি প্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশ রূপে প্রদত্ত

তুলারাম সিংহ

দর্শন বিভাগ

রেজি নং – 133324 of 2015 - 16

রোল নং – MPPH194013

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০১৯

Certified that the thesis entitled, **মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের দার্শনিক গুরুত্বের অনুসন্ধান**, submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Department of Philosophy of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at one day state level seminar, titled **Philosophical Explorations**, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Tularam Singha 14.05.19

TULARAM SINGHA

Roll No.: MPPH194013

Registration No.: 133324 of 2015-16

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Tularam Singha entitled, **মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের দার্শনিক গুরুত্বের অনুসন্ধান,** is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Department of Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarkar 13/05/19

Head
Department of Philosophy

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Madhumita Chattopadhyay

Supervisor &
Convener of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Goswami

Member of RAC

Assistant Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার নিবন্ধের মুল আলোচ্য বিষয় "মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের দার্শনিক গুরুত্বের অনুসন্ধান"। অর্থাৎ দার্শনিক দিক থেকে এই বইয়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কোথায় নিহিত আছে তা খুঁজে বার করা।এই নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বর্তমান আধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয় মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বহু মূল্যবাণ সময় ব্যায় করে আমার বিষয় সম্বন্ধে আমাকে অতি যত্ন সহকারে পড়িয়েছেন ও বুঝিয়েছেন। কিভাবে নিজেকে তৈরী করলে আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হব, সেই বিষয়েও আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। যার আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত আমার এই নিবন্ধ রচনা করা সম্ভব হত না। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও আন্তরিকভাবে ঋণী।আবার এই নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অন্য একজন অধ্যিপিকা শ্রদ্ধেয় গার্গী গোস্বামী-র অবদানও অনস্বীকার্য।তিনিও এই বইয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ করেছেন।এজন্য তাঁর কাছেও আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এর সঙ্গেঁ বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা মণ্ডলীর কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।তাঁরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া বিভাগের দিদি শ্রেয়সী মজুমদার ও আমার বন্ধু সাহেব সামন্ত এবং অন্যান্যরাও আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে আমার এই কাজ সম্পন্ন করতে। তাই তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যাবাদ জানাই।

সবশেষে আমি আমার মাতা-পিতা কাছে বিশেষভাবে ঋণী। যদিও তাঁদের শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান নেই তবুও তাঁরা আমাকে এই নিবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে উৎসাহ প্রদান ও মানসিক ভাবে সাহায্য করেছেন।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১ - ২৪
প্রথম অধ্যায়		
মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে অবলম্বিত যৌক্তিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ	--	২৫ - ৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
অধিবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা	--	৩৬ - ৫০
তৃতীয়		
নৈতিক আলোচনার দৃষ্টান্ত	--	৫১ - ৫৮
চতুর্থ অধ্যায়		
পরিবেশগত নীতিবিদ্যার পরিচায়ক মিলিন্দপ্রশ্ন	--	৫৯ - ৯১
উপসংহার	--	৯২ - ১০৩
গ্রন্থপঞ্জি	--	১০৪ - ১০৬

ভূমিকাঃ-

মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটি পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।যেখানে রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনের মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শনের বহু বিতর্কিত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।যদিও এই গ্রন্থটিকে Non-Canonical বলা হয় তবুও বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির মর্যাদা কিন্তু যে কোনো Buddhist Canonical Literature থেকে কম নয়।মূল গ্রন্থটি সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় কিংবা উত্তর ভারতের কোনো এক আঞ্চলিক ভাষায়(প্রাকৃতে) রচিত হয়েছিল। তবে বহু খোঁজা খুঁজির পরেও এখনো এই মূল গ্রন্থের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।এমনকি গ্রন্থটির লেখক কে এবং কোন সময়ে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছিল তা নিয়েও গবেষকদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেই। কালক্রমে এই মূল গ্রন্থটি ভারতবর্ষ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।অনেকে মনে করেন যে, এই গ্রন্থখানি সিংহলে (শ্রীলংকা) স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং পরে সেই দেশের আচার্যগণ গ্রন্থটিকে পালি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনূদিত গ্রন্থই হছে বর্তমানের পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দপন্হ'। পরবর্তী কালে এই অনূদিত মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটি সিংহল থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত ব্রহ্মদেশ,শ্যামদেশ এবং প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের ভাষায় এর অনুবাদ করেন। অন্যদিকে এই গ্রন্থটি একাধিকবার চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যেমন-'The Book of the

Bhikkhu Nagasena Sutra' তবে এগুলি মূলত সংস্কৃত থেকে না পালি গ্রন্থ থেকে অনূদিত হয়েছিল তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না,কারণ এবিষয়ে গবেষক বা পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এপ্রসঙ্গে Rhys Davids বলেন যে,"এটিকে কেবলমাত্র এমন একটি গ্রন্থ হিসাবে দেখা ঠিক নয় যা উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধ কতৃক রচিত হলেও দাক্ষিণাত্যের কট্টরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় কতৃক শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে।এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য রূপে আজও বর্তমান"।[1] (It is not merely the only work composed among the Northern Buddhists which is regarded with reverence by the orthodox Buddhists of the Southern schools, it is the only one which is survived at all amongst them).

বৌদ্ধদর্শনের অন্তর্গত নানান বিতর্কিত বিষয় ও সমস্যা গুলির প্রতি আলোকপাত করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করাই ছিল এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।যেমন-অনাত্মবাদ,জন্মান্তরবাদ, কুশল ধর্ম প্রশ্ন প্রভৃতির আলোচনা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে সকলেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে।তবে এই আলোচনাটা রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে কথোপকথন রূপে

[1] Sacred Books of the East, Vol. XXXV, Intro, p. Xii.

উপস্থাপিত হয়েছে।যেখানে রাজা মিলিন্দ একের পরে এক উভয় কোটিক প্রশ্নের উপস্থাপন করছেন, অন্যদিকে ভিক্ষু নাগসেন নানা রকম দৃষ্টান্ত, উপমার দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাঁর (রাজার) সন্দেহ দূর করেছেন।এরূপ কথোপকথনের মাধ্যমে দুরূহ তত্ত্বের যে গম্ভীর আলোচনা করা হয়েছে তা ভারতীয় পণ্ডিতবর্গকে শুধু নয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গকেও বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছিল।যে করণে হয়তো কোনো কোনো পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটোর বিখ্যাত ডায়লগ-এর সাথে মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।আবার কোনো কোনো ব্যক্তি যেমন,বেবর প্রমুখ মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের উপর প্লেটোর প্রভাব কল্পনা করতেও পিচ্ছুপা হন নি। তবে মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি, ভাষার প্রসারতা, উপমা ও দৃষ্টান্তের ব্যবহার ইত্যাদি হতে জানা যায় যে এই গ্রন্থটি প্লেটোর 'ডায়লগ' গ্রন্থের বহুকাল আগে রচিত।কারণ ভারতীয় আচার্যদের কাছে এরূপ রচনা পদ্ধতি বহুকাল আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থের মূল চরিত্রঃ-

এই গ্রন্থের নায়ক হিসাবে আমাদের কাছে দুটি চরিত্র ভেসে উঠে,রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেন।কারণ এই দুইজন ব্যক্তির কথোপকথনের মাধ্যমেই এই গ্রন্থটি এগিয়ে গেছে।মিলিন্দ হলেন ইতিহাস বিখ্যাত ইন্দোগ্রীক সম্রাট মিনান্ডার বা মেনান্ডার, যিনি একই সাথে ন্যায় পরায়ণ ও জনপ্রিয় রাজা

ছিলেন।চীনা অনুবাদে যাকে আমরা ‘মিলন’নামে এবং তিব্বতীয় তাঞ্জুর সংকলনে ‘মিলিন্দ্র’ নামে পেয়ে থাকি। ‘মিলিন্দ’ শব্দটি ‘মেনান্ডার’ শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে।জানা যায় যে রাজা মিলিন্দ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ থেকে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বৎসর রাজত্ব করেছেন। ব্যকট্রিয় গ্রীকরাজাদের মধ্যে যারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করতেন তাঁদের মধ্যে রাজা মিলিন্দ ছিলেন সর্বাধিক শক্তিশালী।এই গ্রন্থের বিবরণ হতে জানা যায় যে, তিনি পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং একটি বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘকে দান করেন।এই গ্রন্থের অপর চরিত্র নাগসেন সম্বন্ধে তেমন কোন পরিচয় দেওয়া যায় না কারণ অনেক খোঁজা খুঁজির পরেও নাগসেনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তেমন কোন পুথি এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি।[1] তবে পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির – এর বঙ্গানুবাদের মুখবন্ধ হতে নাগসেন সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।সেখানে বলা হয়েছে ‘স্থবির নাগসেন মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ আচার্য নাগার্জুন হতে স্বতন্ত্র।তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কজঙ্গল গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।তাঁর পিতা নাম ছিল সোনুত্তর।হিমালয়ের বর্তনীয় আশ্রমে শ্রদ্ধেয় রোহণ স্থবির তাঁকে প্রবজ্যা দান

[1] Law, B. C, A History of Pali Literature, pp. 360-361.

করেন।নাগসেন বেশ প্রতিভাবান ছিলেন, যার দরুণ নাগসেন খুব অল্প সময়ে অভিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[1]

নামকরণের তাৎপর্যঃ-

'মিলিন্দপন্হা' এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি শব্দ পাই,যথা- 'পন্হা' এবং 'মিলিন্দ'। 'পন্হা' শব্দের অর্থ 'প্রশ্ন' আর 'মিলিন্দ' হল রাজার নাম।সুতরাং মিলিন্দপন্হা বলতে বোঝায় 'মিলিন্দের প্রশ্ন' অথবা 'মিলিন্দ দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন'।এই মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটি পালি ত্রিপিটক বহির্ভূত থেরবাদী বৌদ্ধদের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং যা এখনো ব্যাপক ভাবে অধ্যয়ন করা হয়।এই গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনকেই লিপি বদ্ধ করা হয়েছে। রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধদর্শনের নানান বিতর্কিত বিষয়ে নাগসেনের কাছে একে একে প্রশ্ন করছেন এবং ভিক্ষু নাগসেন সেই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উওর নানান যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদান করছেন।মিলিন্দের প্রশ্ন ও ভিক্ষুর উওর প্রদানের মাধ্যমেই যেহেতু এই কথোপকথন এই বইয়ের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে বা ফুটে উঠেছে তাই এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে 'মিলিন্দপ্রশ্ন'। মিলিন্দ তত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন বলেই কিন্তু ভিক্ষু উত্তর প্রদান করছেন, নিজে থেকে ভিক্ষু কোন তত্ত্বের উপস্থাপন করছেন না। অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর জানার

[1] পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, *মিলিন্দ প্রশ্ন*, মহাবোধি, কোলকাতা, পৃঃ ৩৫।

ইচ্ছাটাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, উত্তর প্রদানকারীর উত্তর দেওয়া নয়।তাই বলা যায় যে 'মিলিন্দপ্রশ্ন' গ্রন্থটির নামকরণ অত্যন্ত সার্থক।

গ্রন্থের লেখক ও রচনা কালঃ-

গ্রন্থকার ছাড়া কোনো গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়।যেকোন গ্রন্থের একজন রচয়িতা থাকে।মিলিন্দপ্রশ্ন একটি পালি গ্রন্থ তাই এই গ্রন্থেরও একজন রচয়িতা থাকবে। কিন্তু মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের রচয়িতা কে? –তা বলা যায় না। কারণ এই বই-এর গ্রন্থকর্তা নিয়ে পন্ডিত মহলের পক্ষে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো তথ্য খুজে বার করা সম্ভব হয় নি।তবে গ্রন্থকারের নাম, পরিচয় অজ্ঞাত ও অজানা থাকলেও Mrs Rhys Davids তাঁর গ্রন্থে একজন ব্রাহ্মণ যুবককে গ্রন্থকর্তা রূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং যাকে তিনি তাঁর গ্রন্থে 'মানব' নামে অভিহিত করেছেন সংস্কৃতে যার অর্থ 'ব্রাহ্মণ যুবক'। এখানে শ্রীমতী রীস্ ডেভিডস্–এর নিজের কথাই উল্লেখ করা যাক -- "And since 'the child must have a name', and any young Brahman was called Manava- a word which also appears to have served as a proper name – I propose to refer to him straightway as Manava. By some felicitous coincidence of fate or design, it may possibly

have actually been his name, may be so still!"[1]. এই ব্রাহ্মণ যুবক সাগল নগরের নিকটবর্তী কোনো এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বড় হয়ে লেখকের কাজে(পেশায়) নিযুক্ত হয়ে লেখক হিসাবে অত্যন্ত যশ ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অন্যদিকে মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থখানি কবে লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে পন্ডিত মহলে সংশয়ের শেষ নেই।তাই এই গ্রন্থের ঠিক সময়কাল নির্ণয় করা কিছুটা কঠিন।তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে এই গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে লেখা হয়েছিল , আবার কারো কারো মতে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে লেখা হয়েছিল। তবে আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর গ্রন্থগুলির কয়েক স্থানে মিলিন্দপ্রশ্নের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর সময়ের দু-একশো বৎসর আগে থেকেই এই পালি গ্রন্থটি সিংহলে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান ছিল।T.W. Rhys Davids এই বইটি সম্পর্কে বলেন যে,এই বইটি পালি পিটক গ্রন্থ গুলির পরবর্তী পর্যায়ের কারণ মিলিন্দপনহা গ্রন্থের লেখক বিভিন্ন পিটকের থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু এই গ্রন্থটি অন্যান্য মহান অর্থকথা থেকে পুরনো শুধু নয়, এটি একমাত্র বই যা পিটকের অন্তর্ভূক্ত না হয়েও পিটকের সমান গুরুত্ব লাভ করেছে" "the book is later than the canonical books of

[1] The Milinda Questions, p. 11.

the Pali Pitakas (the author of the Milindapanha quotes a large number of passages from the Pitaka texts), and on the other hand, not only older than the great commentaries, but the only book outside the canon, regarded in them as an authority which may be implicitly followed".[1]

ভাষাশৈলীঃ-

মিলিন্দপনহা গ্রন্থের একটা নিজেস্ব রচনা পদ্ধতি বর্তমান।এই গ্রন্থটি প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের ধাঁচে রচিত এবং এর ভাষা অত্যন্ত মার্জিত।যার জন্য পাঠক বৃন্দ একবার পড়েই এই গ্রন্থের রস আস্বাদন করতে পারেন বা গ্রন্থের মর্মকথা বুঝতে পারেন।তাই স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় এই গ্রন্থটি অন্যান্য রচনার মধ্যে ছিল একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। পরবর্তী কালে বৌদ্ধপালি বা সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল এই গ্রন্থটি, যা কিনা শীঘ্রই পিটকের যথাযথ সম্মানে ভূষিত হয়েছিল।

মিলিন্দপ্রশ্নে ভিক্ষু নাগসেন, রাজাকে কিন্তু কোনো উপদেশ দান করছেন না বা তাঁর মতের খন্ডন করছেন না। তিনি যেটা করছেন তা হল- রাজার বক্তব্যের মধ্যে যে পূর্বস্বীকৃতি রয়েছে, সেগুলি যে অসঙ্গতি পূর্ণ তা

[1] Sacred Books of the East, Vol. XXXV. Intro., p. xxxviii.

দেখানোর চেষ্টা।আমরা জানি পাশ্চাত্য দার্শনিক সক্রেটিসের মূল লক্ষ্যই ছিল,যাকে তিনি প্রশ্ন করবেন এবং সেই ব্যক্তি যে উত্তর দিবেন,সেই উত্তরটা ভুল- এটা দেখানো।কিন্তু নাগসেন সেটা করছেন না, মিলিন্দ যে প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্নেরই কেবল উত্তর প্রদান করছেন।অর্থাৎ এখানে নাগসেনের কাজ হচ্ছে একজন জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করা।তবে এই জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার প্রকৃতি অনুসারে প্রশ্নের ধরণটা মাঝে মধ্যে পাল্টে যাচ্ছে।এই জন্য আমরা *মিলিন্দপ্রশ্নে* পাঁচ ধরনের প্রশ্নের উল্লেখ পাই।এই পাঁচ প্রকার প্রশ্ন হল- (১)লক্ষণপ্রশ্ন (২)মেণ্ডকপ্রশ্ন (৩)অনুমান প্রশ্ন (৪)উপমাকথা প্রশ্ন এবং (৫)বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন।কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে কি কারণে প্রশ্ন গুলির মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হল? উত্তরে বলতে হয়, যেহেতু উপস্থাপনের ভঙ্গির (mode of presentation) ওপর প্রশ্নের ধরনটা নির্ভর করে সেহেতু ক্ষেত্র বিশেষে প্রশ্ন গুলির মধ্যে ভেদ দেখা যায় ।অর্থাৎ যখন কোনো বিষয়ের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন সেই প্রশ্নটিকে **লক্ষণ প্রশ্ন**- এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে,যেমন-আত্মা,শীল বিষয়ক প্রশ্ন; উভয় কোটিক বিষয়কে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন করা হয় তা হল **মেণ্ডক প্রশ্ন** যেমন-বুদ্ধ পূজা সফল কি না?; যখন কোনো বিষয়ের (অদৃষ্ট) অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয় বা বস্তুটি আছে কিনা তার প্রমাণ কী? এরূপ যে প্রশ্ন করা হয় তাকে **অনুমান প্রশ্ন** বলা হয়েছে।এর দৃষ্টান্ত হিসাবে

নিম্নলিখিত প্রশ্নটিকে যেমন- আপনি বুদ্ধকে দেখেননি,আপনার আচার্যরাও বুদ্ধকে দেখেননি, তাহলে মনে হয় যে বুদ্ধ নিশ্চয় অতীতে ছিলেন না?; সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় সেরূপ প্রশ্নকে **উপমাকথা প্রশ্ন** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে,যেমন-কি কি গুণ থাকলে একজন ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করে?; এবং কোনো বিষয় সর্ম্পকে আমাদের মনে যখন সংশয়ের অবকাশ জন্মে, তখন সেই সংশয়ের দূরীকরণের জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা হল **বিমতিছেদন প্রশ্ন**,যেমন- বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কা অথবা বুদ্ধ অনুত্তর(শ্রেষ্ঠতম) কি?

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশ্নগুলির স্বরূপ নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন বোঝা যায় যে অপরকে ঠিক ঠিক উত্তর না দিতে পারার ক্ষেত্রে আমাদের যে ভুলটা হয় তা হল ভাষার বৈচিত্রকে বুঝতে না পারা, যাকে ভাষাদর্শনে ভাষাশৈলীর সমস্যা (problem of language) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।পাশ্চাত্য দর্শনে ভাষাটা একটা সময় বাচ্য (reference) হিসাবে কাজ করতো কিন্তু পরবর্তী কালে আপত্তি উঠলো যে, কেবল মাত্র বাচ্য-কে নির্দেশ করা ভাষার কাজ হতে পারে না, ভাষার কাজ হচ্ছে বহুমাত্রিক।তার মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হল বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করা।তাই বলতে হয় যে, বক্তা তার মনোভাব যে ভঙ্গিতে উপস্থাপন করবে, সেই উপস্থাপনের ভঙ্গির ওপর

নির্ভর করেই প্রশ্নের ধরনটা নির্ধারিত হবে।এই কারনেই প্রশ্নগুলির মধ্যে ভেদ দেখা যায়।

ধম্মসঙ্গাঁনি গ্রন্থের অট্টকথা 'অত্থসালিনী' অনুসারে প্রশ্নের উদ্দেশ্য পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে,যথা-

(১) অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্নঃ- যে বিষয়কে আমি জানি না, সেই বিষয়কে জানার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা হল অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন।এই প্রশ্নটা মূলত লক্ষণ বিষয়ক হয়ে থাকে।

(২) দৃষ্টসংতুলন প্রশ্নঃ- কোনো বিষয়কে জানি কিন্তু বিশেষ ভাবে জানি না,সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিষয়টাকে জানার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা হল দৃষ্টসংতুলন প্রশ্ন।

(৩) বিমতিচ্ছেদন প্রশ্নঃ- কোনো বিষয় সর্ম্পকে আমাদের মনে যখন সংশয়ের অবকাশ জন্মে, তখন সেই সংশয়ের দূরীকরণের জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা হল বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন।

(৪) অনুমোদন প্রশ্নঃ- কোনো বিষয় সর্ম্পকে একটা মত উপস্থাপন করা হয়েছে।কিন্তু অপর ব্যক্তিরা সেই মতের অনুমোদন করে কি না, তা জানার জন্য যে প্রশ্ন তা হল অনুমোদনের প্রশ্ন।

(৫) কথনেচ্ছার প্রশ্নঃ- অপরকে জানানোর জন্য যে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে তা হল কথনেচ্ছার প্রশ্ন।অর্থাৎ এখানে অন্যের কাছে কিছু তুলে ধরার জন্য বক্তা শ্রোতাকে কোন প্রশ্ন করতে পারেন।

সমগ্র *মিলিন্দপ্রশ্নে* এই পাঁচ প্রকার উদ্দেশ্যই কার্যকারি হয়েছে ।তবে এই পাঁচ প্রকার উদ্দেশ্য কার্যকারি হলেও এখানে যে ভঙ্গিতে প্রশ্ন গুল করা হয়েছে সেই উপস্থাপন ভঙ্গির তফাৎ-এর জন্য প্রশ্ন গুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

এই গ্রন্থের গুরুত্বঃ-

কেবল মাত্র একটি গ্রন্থ পাঠ করে যারা বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সর্ম্পকে জ্ঞানলাভ করতে ইচ্ছুক তাদের কাছে এই বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম ।কারণ এই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত গভীর জটিল তত্ত্বের সমন্বয় ঘটেছে,যা আর অন্য কোনো গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের প্রশ্ন গুলি তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত ও জটিল হলেও সমাধান সমূহ কিন্তু অতি সরল ভাষায় যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আলোচিত হয়েছে , যাতে করে সকলেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। আমরা দেখবো এই গ্রন্থটিতে মূলত বুদ্ধের দ্বারা যে দেশনা বা তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে নাগসেন এই দেশনা গুলিকে স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পালিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন । কিন্তু নাগসেন

যখন সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত রাজা মিলিন্দের জিজ্ঞাসার দ্বারা বিচলিত হচ্ছেন বা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তখন তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিটকের বাইরে গিয়ে এমন কিছু পংক্তি ব্যবহার করেছিলেন যেগুলির মধ্যে (পংক্তি গুলির মধ্যে) সত্যিই শাস্ত্রের রস বা আস্বাদন পাওয়া যায়, যা (রস) কখনও কখনও পিটকের মধ্যেও খুজে পাওয়া যায় না।অর্থাৎ তিনি (নাগসেন) জিজ্ঞাসুর অভিপ্রায়কে দমন করার জন্য এমন কিছু মতবাদ বা ধারণার উল্লেখ করেন, যা পালি প্রথার সাথে অভিনব।[1] এই গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক মতবাদ ও ধারণা রয়েছে নিদর্শন হিসাবে, যা দেখে অবাক হতে হয়।এমনকি আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞানে যে সমস্ত তত্ত্ব খুবই প্রচলিত হয়েছে সেই সমস্ত তত্ত্বের এক একটি পরিচয় যেন আমরা এই মিলিন্দপ্রশ্নে গ্রন্থটিতে পাই।এই সমস্ত কারণে এই গ্রন্থটিকে শুধুমাত্র অভিনব বললেই চলে না আধুনিকও বলতে হয়। কিছু গবেষক এরকম কিছু non-canonical term ও ধারণার উল্লেখ করে বলেন যে, নাগসেন বৌদ্ধ দর্শনের negative dogmatism কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে করে (সেই

[1]. Rabindranath, Basu, A Critical Study of the Milindapanha, Firma KLM Private limited, Calcutta, 1978, p. 10. (I. B. Horner is right in regard to the liberty of Nagasena in choosing freely non-canonical notions when she says that "through he freely cites statements and sayings that had been recorded in the Pali Canon already, he was also perfectly at liberty to take what he liked from literature outside this)

অনুযায়ী) বৌদ্ধদর্শনের একটি নতুন ধারার উন্নতিকে তরান্বিত করেছেন, অন্যথা এই ধারাকে মহাযান হিসাবে জানা হতো।[1] কেননা ধর্মকায় শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা, গভীর নিষ্ঠার দ্বারা বন্ধনমুক্তি, বোধিসত্ত্বের আদর্শ, গুণের স্থানান্তর, ধর্মীয় ভাবধারার অনুশীলন, এ সমস্ত বিষয়ে হীনযানীদের থেকে মহাযানীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান। উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক দিক থেকে হীনযানীরা মানুষের আত্মার অনুভবকে এড়িয়ে গেছেন।[2] এখন আমরা অনুরূপ এমন কিছু মতবাদ ও ধারণার আলোচনা করবো যা এই গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।যেমন – রাজা মিলিন্দ নাগসেন কে প্রশ্ন করছেন বুদ্ধের বিদ্যমানতা সর্ম্পকে যে, ভগবান বুদ্ধ এখানে বা সেখানে কোথায় আছেন তা আপনি দেখাতে পারেন কি? তার উত্তরে নাগসেন বলেন ভগবান বুদ্ধ এখানে বা সেখানে আছেন তা দেখানো যায় না কারণ তিনি অনুপাদিশেষ নির্বান ধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন, যার পর আর ব্যক্তিত্বের কোনো নিদর্শন থাকে না। কিন্তু ধম্মকায় দ্বারা ভগবানকে প্রদর্শন করা যায়, যেহেতু ধম্মকায় ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক নির্দেশিত

[1] Ibid, p. 10. ("The 'negative dogmatism' of Buddhism as explained by Nagasena hastened the process of development of the new forms of Buddhism otherwise known as Mahayana")

[2] Ibid, p. 10. (The Hinayana ignored the groping of the spirit of man after something higher and wronged the spiritual side of man).

হয়েছে।এই ধম্মকায় শব্দটি Instrumental case –এ ব্যবহার করা হয়েছ, যা কখনো কখনো থেরবাদী শাস্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায়।[1]

যদিও বৌদ্ধত্রিপিটক-ই মিলিন্দপ্রশ্নের মূল ভিত্তি তবুও সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত পরিচয়ের নানা নিদর্শন এই গ্রন্থের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।যেমন-বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, জন্মান্তর বাদ, বোধিসত্ত্বগণের স্বরূপ ইত্যাদির আলোচনা এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে, যা পরবর্তী কালে পন্ডিত গণের গবেষণার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।তাছাড়া বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্গত অভিধম্ম পিটক এই গ্রন্থের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ এই গ্রন্থের মধ্যে 'অভিধম্ম' শব্দটিকে মূলত ১১ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

১) গাঁথার প্রারম্ভে নাগসেনকে একজন অভিধম্মের পারদর্শি বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।[2]

[1] Ibid, pp. 11.

[2] V, Trenckner, *Milindapanha*, Edited, Pali Text Society, London, 1986, p. 1.

২) নাগসেন তাঁর গুরু রোহনের কাছ থেকে একবার মাত্র অভিধর্ম বিষয় শোনে সমগ্র অভিধম্ম পিটক হৃদয়াঙ্গম করে এক অসাধারন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[1]

৩) নাগসেন অর্হৎ সঙ্ঘের নিকট উওপস্থিত হয়ে সাতটি অভিধম্ম প্রকরণ বিস্তার পূর্বক প্রকাশ করেন ।ফলে পৃথিবী কম্পিত হল, দেবতারা সাধুবাদ দিলেন, ব্রহ্মাগণ করতালি দিলেন এবং মান্দার পুষ্পরাশি বর্ষিত হল[2]।

৪) নাগসেন তাঁর ভক্তকে (উপাসিকা)শূন্যতা (নির্বাণ) বিষয়ে গভীর ধর্মপোদেশ দান করে তাকে নিবৃত করেছিলেন এবং শেষে উভয়ে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন[3]।

৫) পাটলিপুত্র নগরে গমন করার সময় নাগসেন এক বণিকের কাছে অভিধম্ম বিষয় প্রকাশ করেন এবং তৎক্ষণাৎ বণিকের ধর্মচক্ষু জ্ঞান উৎপন্ন হল, যাকিছু উৎপন্নশীল তা বিনাশশীল[4]।

---

[1] Ibid, p. 12.

[2] পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার, মহাস্থবির, মিলিন্দপ্রশ্ন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা,২০১৩, পৃ. ১১।

[3] ঐ, পৃ. ১৩।

[4] ঐ, পৃ. ১৪।

৬) অনন্তকায়ের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রসঙ্গে নাগসেন অভিধম্মের আশ্রয় নিয়ে এমন ভাবে ব্যাখ্যা দেন যে তৎক্ষণাৎ অনন্তকায়ের ধর্মচক্ষু জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং নিজের উপাসকত্ব নাগসেনের প্রতি নিবেদন করলেন[1] ।

৭) ১০৮ প্রকার বেদনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নাগসেন পুনরায় অভিধর্মের উপদেশ করেন। বেদনাকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যথা- কুশল (পূণ্য), অকুশল (পাপ) এবং অব্যাকৃত (অপাপ-অপূণ্য)। এদের প্রত্যেকটিকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ।যেমন- ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের (মানসিক)সুখ, ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের সুখ,ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের দুঃখ, ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের দুঃখ, ছয় প্রকার সাংসারিক জীবনের উপেক্ষা এবং ছয় প্রকার নিষ্কাম জীবনের উপেক্ষা একত্রিত হয়ে ছয় ছক্কা ছত্রিশ হয়।এই ভাবে অতীত কালের ছত্রিশ বেদনা, বর্তমান কালের ছত্রিশ বেদনা,এবং ভবিষ্যত কালের ছত্রিশ বেদনা একস্থানে সংযুক্ত হয়ে ১০৮ প্রকার বেদনা হয়ে থাকে[2]।

[1] ঐ, পৃ. ২৬।
[2]ঐ< পৃ. ৪০।

৮) আত্মা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন অভিধম্মকে অনুসরণ করে আত্মার অনস্তিত্বতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[1]

৯) নাগসেনের কাছে, অভিধম্ম হল বিভিন্ন পথের মিলন ক্ষেত্র।[2]

১০) যারা অভিধম্ম বিষয়ে বিজ্ঞ নাগসেন তাদেরকে 'অভিধার্মিক' পদ দ্বারা নির্দেশিত করেছেন।[3]এবং

১১) নাগসেন এটাও উল্লেখ করেছেন যে, অবশ্যই একজন যোগাচারে স্থির শিষ্যের অভিধর্ম ব্যাখ্যার জ্ঞান থাকা উচিৎ।[4]

সুতরাং বলা যায় যে, ধম্মকে(গুঢ তত্ত্ব) বোঝানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে এই গ্রন্থটি অন্যান্য পিটকের তুলনায় অভিধম্ম পিটকের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বা আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ঃ-

মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।যথা ১.বহির কথা ২.লক্ষণ প্রশ্ন ৩.বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন ৪.মেণ্ডক প্রশ্ন ৫.আনুমান প্রশ্ন ৬.ধূতাঙ্গ কথা প্রশ্ন এবং

[1]V, Trenckner, *Milindapanha*, Edited, Pali Text Society, London, 1986, pp. 56-57.
[2]Ibid, p. 332.
[3] Ibid, p. 341.
[4] Ibid, p. 381.

৭.উপমা কথা প্রশ্ন।এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়টিকে বর্ণনা করা যেতে পারে এই গ্রন্থের পটভূমি হিসেবে, যেখানে আমরা পাই রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের পূর্ব পরিচয়, কিভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং যে শহরে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল সেই শহরের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা ।এই অধ্যায়টির নাম হল বহির কথা, কারণ এই গ্রন্থে যে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে সেই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে এই সমস্ত পূর্ব কথার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এগুলি সেই অর্থে তত্ত্বালোচনার বাইরের কথা।মূলত দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বস্তুর উপস্থাপন করা হয়েছে । এই দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম হছে লক্ষণপ্রশ্ন ।'লক্ষণপ্রশ্ন' এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এই অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত যে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যে ধারণা গুলি রয়েছে তাদের লক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং লক্ষণের মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্যকথার (ধারণার) পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে লক্ষণ প্রশ্ন।এই লক্ষণ প্রশ্নে অনাত্মবাদের ধারণাকে যথার্থ উপমা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই ব্যাখ্যাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা।একজন ব্যক্তির চরিত্র শুদ্ধির ক্ষেত্রে যে সব নৈতিক গুণাবলী প্রয়োজন সেই নৈতিক গুণগুলির পরিচয় ও তাদের বৈশিষ্টের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।তাছাড়া কাল, ধর্মসন্ততি (অন্যদেহে

কিভাবে সংক্রমণ ঘটে), পঞ্চস্কন্ধ প্রভৃতি বিষয় এবং কার সাথে কিভাবে বাদ বা বিচার করতে হয় তা সম্বন্ধেও একটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।বিমতিচ্ছেদন প্রশ্নে, বৌদ্ধদর্শনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব বিষয়ে মাঝে মধ্যে যে সংশয় দেখা দিত সেই সমস্ত তত্ত্বের সংশয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।যেমন- সংক্রমণ বিনা প্রতিসন্ধি হয় কিনা?, কর্ম ও কর্মের ফল আস্তিত্বশীল হয় কিনা?, বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কা, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ছিলেন কিনা? ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশ্নের নিরসন পূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মেণ্ডক প্রশ্নে বিভিন্ন প্রকার উভয় কোটিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে,যে প্রশ্নগুলি মূলত ভগবান বুদ্ধকে কেন্দ্র করে করা হয়েছিল,যেমন-বুদ্ধপূজা সফল কিনা?, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ কিনা? এছাড়াও এই অধ্যায়ে বাদের স্থান এবং বাদের উপযুক্ত ব্যক্তি কে হবে অর্থাৎ কোন কোন স্থানে বাদ-বিচার করা উচিৎ নয় এবং কোন কোন ব্যক্তির সাথে বাদ বিচারে নিযুক্ত হতে নেই তার একটা স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। অনুমান প্রশ্ন নামক এই অধ্যায়ে অনুমান সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। যেমন- রাজা মিলিন্দ, নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করছেন,বুদ্ধ যে বিদ্যমান ছিলেন তা আপনি কীভাবে বলতে পারেন? নাগসেন এই প্রশ্নের উত্তর যথাযথ উপমার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি রাজা মিলিন্দকে বলছেন মহারাজ আপনার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন

তা আপনি বিশ্বাস করেন এই যুক্তিতে –পূর্ব পুরুষগণের ব্যবহৃত পরিভোগ্য দ্রবগুলি দেখা যায়।যেমন শ্বেতছত্র, উষ্ণীষ, মহার্ঘ্য শয্যা সমূহ প্রভৃতি যার দরুণ আমরা জনতে পারি বা বিশ্বাস করতে পারি যে পূর্বপুরুষগণ ছিলেন, একই ভাবে ভগবান বুদ্ধকেও জানতে হবে। ধুতাঙ্গ কথা প্রশ্ন নামক এই অধ্যায়ে ধুতাঙ্গ ব্রত পালনকারী ও গৃহীদের ধর্মজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য বর্তমান তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।যেমন- রাজা মিলিন্দ যখন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে ধুতাঙ্গ ব্রত পালনকারী ভিক্ষুদের দেখলেন এবং অরণ্যের বাহিরে এসে অনাগামী ফলে প্রতিষ্টিত গৃহীদেরও দেখলেন। উভয়কে দেখার পর রাজার মনে এক মহা সংশয় উৎপন্ন হল, গৃহীধর্মে থেকেই যদি ধর্মজ্ঞান লাভ হয় তাহলে ধুতাঙ্গ ব্রত নিষ্ফল। এই যে সংশয় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ধুতাঙ্গ কথা প্রশ্ন নামক এই অধ্যায়ে।সবশেষে উপমাকথা প্রশ্ন নামক অধ্যায়ে নির্বাণে অভিলাসী ব্যক্তির বা একজন ভিক্ষুর কি কি গুণ থাকা দরকার তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত ৬ টি অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় গুলির পরিচয় পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে কোন কোন ধারণা গুলি দর্শনের ধারণার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত তা খুঁজে বার করে তাদের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমার এই গবেষণা পত্র।তবে

আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলিকে মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। একটি আধিবিদ্যক এবং অপরটি নৈতিক।

আধিবিদ্যক বিষয়ক আলচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা প্রথমেই এই গবেষণাগ্রন্থে আত্মা সংক্রান্ত আলোচনা করছি। কেননা ব্যক্তি বা আত্মা বিষয়ক আলোচনা এই গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।এখানে দেখানো হচ্ছে আত্মা বলে কোনো কিছু নেই, আত্মা একটি নাম মাত্র।পঞ্চস্কন্ধকে আশ্রয় করেই এই নামটি ব্যবহৃত হয় মাত্র। এই নামের মধ্যে দিয়ে কোনো আত্মা বা পুদগলের উপলব্ধি হয় না। ব্যক্তির সাথে এই নামের সম্পর্কটি কীরূপ তারও একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। যে ব্যাখ্যাটা বিশেষত আর অন্য কোন গ্রন্থে দেখতে পাই না।

অপরপক্ষে এই গ্রন্থটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।যে ধারণা গুলিকে না জানলে বৌদ্ধদর্শনের নৈতিকতাকে বোঝাই সম্ভব নয় সেই সমস্ত ধারণার আলোচনা এখানে দৃষ্টান্ত সহকারে করা হয়েছে।যেমন কুশল ধর্ম প্রশ্ন, শীল, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, সমাধি, বীর্য এবং প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এখানে গভীর ভাবে করা হয়েছে।তাছাড়া একজন মানুষ তার চারিত্রিক বিকাশ কীভাবে ঘটাতে পারে তারও নির্দেশ রয়েছে এই গ্রন্থে ।

এই গ্রন্থের গুরুত্ব বিচার প্রসঙ্গে আমরা আরেকটি তত্ত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। তা হল পরিবেশগত নৈতিক সংক্রান্ত আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে অথবা গ্রন্থটি পরিবেশ নীতিবিদ্যার পরিচায়ক হিসাবে খুবি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেখানে বলা হচ্ছে মানুষই কেবল নৈতিক বিচারের উপাদান হতে পারে এমন নয়, জগতের প্রতিটি বস্তুই নৈতিক বিচারের দাবী রাখে। কারণ প্রতিটি বস্তুরই নিজেস্ব কিছু মূল্য আছে, যার জন্য তারাও স্বাধীন বাভে বাঁচার অধিকার রাখে।মানুষ যেমন পরিবেশের ক্ষেত্রে মূল্যবান তেমনি মানুষ্যেতর প্রাণী থেকে শুরু করে উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিও মূল্যবান।কারণ বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয় জাগতিক বস্তুর পারস্পারিক নির্ভরশীলতার নিরিক্ষে। তাই অন্য প্রাণীর ধ্বংশ কামনা করা উচিৎ নয়। তাছাড়া এই জগতের সমস্ত কিছুই পারস্পারিক নির্ভরশীলতার নিরিক্ষে এগিয়ে চলে।তাই প্রকৃতি থেকে একটা প্রজাতির বিপন্ন হওয়া মানে কিন্তু প্রাকৃতির বিপন্নতাকে ডেকে নিয়ে আশা।আবার মনুষ্যেতর প্রাণীকেও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে দেখা হয়েছে এই গ্রন্থে।

কেবল আধিবিদ্যক তত্ত্ব বা নৈতিক তত্ত্বের আলোচনাই যে এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা কিন্তু নয়।এই গ্রন্থটিকে যুক্তি পদ্ধতির পথনির্দেশক হিসাবেও দেখা যায়। বৌদ্ধযুক্তি শাস্ত্রে বাদের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি

বিষয়।এই প্রসঙ্গেই মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটি বাদ-বিচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।এই গ্রন্থের মধ্যে বাদ কীভাবে করতে হয়, কোন পদ্ধতিতে করতে হয়, কোন কোন স্থান বাদের পক্ষে অনুপযোগী এবং কোন ব্যক্তির সাথে বাদে নিযুক্ত হওয়া উচিৎ নয় তার একটা স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই।তাছাড়াও এই গ্রন্থে বাদের একটি আলাদা রূপ দেখা যায়।এখানে ব্যক্তির পদ মর্যাদা অনুযায়ী বাদকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে পণ্ডিত ব্যক্তির এবং পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে পণ্ডিত ব্যক্তির।এই উভয় প্রকার বাদের মধ্যে কীরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়,তা নির্দেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই দিক থেকে গ্রন্থটি একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হলেও সময়ের অপ্রতুল্যতার কথা মাথায় রেখে এই গবেষণায় দুটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।একটি হচ্ছে আত্মা বিষয়ক যা অধিবিদ্যার অন্তর্গত এবং নৈতিক আলোচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে যে নৈতিক তত্ত্বগুলির বা ধারণাগুলির উপস্থাপিত হয়েছে তার আলোচনা আমরা করেছি এবং উপসংহারে উপনীত হয়ে আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ কোথায় নিহীত আছে।এই সমস্ত আলোচনা করার জন্য আমি মূলত যে পদ্ধতিটির অবলম্বন করেছি তা

বিশ্লেষণাত্মক। অর্থাৎ এই গ্রন্থের উল্লেখিত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে কীভাবে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসাকে সমাধান করা হয়েছে তাই তুলে ধরেছি।

মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থটিতে যখন কোন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তখন তা মূলত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হলেও সেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যেও একটি যুক্তি পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা সেই যৌক্তিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ করব এবং যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত যে যে আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখিত বিচার পদ্ধতিঃ-

ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত ন্যায় দর্শনে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।আত্মাদি পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান আত্মাদি বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান দুর করে, ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃতি সম্ভব।[12]এই আত্মাদি পদার্থের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ন্যায়দর্শনে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিচার নামে পরিচিত।বিচার বলতে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তির পর্যালোচনাকে বোঝায়।পক্ষ বলতে কোনও ধর্মী সম্পর্কে স্বীকৃত বিশেষ ধর্মকে বোঝায়।আবার বিপক্ষ বলতে ঐ

---

[2] ১/১/৯, ন্যায়সুত্র।(আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্)

ধর্মী সম্পর্কে ভিন্ন ধর্মকে বোঝায়।যেমন আত্মার নিত্যত্ব ধর্ম যিনি স্বীকার করেন তিনি পক্ষ হিসাবে এবং যিনি নিত্যত্ব স্বীকার করেন না তিনি প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য হতে পারে।[1] তবে বিচারে অংশগ্রহন কারী ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারে অথবা জয়লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারে।তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যে বিচার তা বাদ নামে কথিত।অন্যদিকে জয়লাভের আবার দুটো অর্থ করা হয়েছে,স্বমত প্রতিষ্টা (জল্প) এবং পরমত খণ্ডন (বিতণ্ডা)। এই জল্প ও বিতণ্ডা স্থলে বাদী প্রতিবাদীকে ভয় দেখিয়ে এবং ছল,জাতি প্রয়োগ করে যে কোনো উপায়ে বিচারে জয়লাভ করতে পারে।

কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে বিচার স্থল হিসাবে শুধুমাত্র বাদ-কেই স্বীকার করা হয়েছে।যার মূল উদ্দেশ্যই হল তত্ত্বজ্ঞান লাভ।এখানে পরস্পরের মধ্যে (পক্ষ-প্রতিপক্ষ) একটা আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে । অর্থাৎ এখানে অন্যের মতের মধ্যে যে ভুল-ত্রুটি গুলো রয়েছে সেই ভুল-ত্রুটি গুলো পরস্পরের আলোচনার মধ্য দিয়ে নিরসন করা হয় মাত্র।যেমন- *মিলিন্দপ্রশ্নে* ভিক্ষু নাগসেন,রাজা মিলিন্দের বক্তব্যের পূর্বস্বীকৃতির মধ্যে থাকা ভুল গুলোর নিরসন পূর্বক বৌদ্ধমতের যাথার্থতা প্রতিষ্টা করছেন মাত্র।

[1] শর্মা, রত্না দত্ত, *ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান,* ভূমিকা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১।

অন্যদিকে বৌদ্ধ দর্শনে বাদের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিসকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এই তিনটি জিনিস হল-আলোচ্য বিষয়, আলোচনা কারী এবং আলোচনার স্থান।এই প্রসঙ্গেই আমরা 'মেণ্ডকপ্রশ্নে' কোনগুলি মন্ত্রণার অযোগ্য স্থান এবং কোন ব্যক্তি মন্ত্রণার জন্য অযোগ্য এরূপ আলোচনা পাচ্ছি।[1] সেখানে বলা হয়েছে গুঢ়তত্ত্বের বিষয়ে মন্ত্রণা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির আটটি স্থান পরিবর্জন করা উচিৎ । এই আটটি স্থান হল-বিষমস্থান, সভয়স্থান, অতিবাতস্থান, প্রতিচ্ছন্ন স্থান,দেবস্থান,চলাচলের পথ,সেতু ও জলের ঘাট।কারণ এই সকল স্থানে মন্ত্রণা করলে মন্ত্রণার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।যেমন বিষম স্থানে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয় ফলে মন্ত্রণার উদ্দেশ্য ছড়িয়ে পরে, সভয় স্থানে মন কুণ্ঠিত হয় ফলে বিষয়ের যথাযথ হৃদয়ঙ্গম হয় না, অতিবাত স্থানে শব্দ অস্পষ্ট হয় যার জন্য ঠিক ভাবে শোনা যায় না, প্রতিচ্ছন্ন স্থানে কেউ গোপনে তত্ত্ব কথা শুনতে পারে, দেব স্থানে (মন্দিরে) আলোচনা করলে আলোচনাটা গুরতর আকার ধারণ করে, চলাচলের পথে আলোচনার কোনো মূল্য থাকে না, সেতুতে লোকের চলাচল থাকে এবং জলের ঘাটে মন্ত্রণার উদ্দেশ্য প্রকাশ্য হয়ে পড়ে।এই জন্যই আলোচনাকারীর এই আটটি স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।কেননা এই আট প্রকার

[1] মহাস্থবির, ধর্মাধার শ্রীমৎ পণ্ডিত, *মিলিন্দপ্রশ্ন*, বঙ্গানুবাদ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩,পৃ ৯০-৮১।

স্থানে কোন না কোন ভাবে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।তাই আলোচনাটা এমন জায়গায় করতে হবে যেখানে পূর্ণ মনোযোগ থাকবে।

অন্যদিকে যে আট প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে নেই সেই আট প্রকার ব্যক্তি হলেন- রাগচরিত বা অনুরাগী, দ্বেষচরিত বা ঘৃণাকারী , মোহচরিত বা যার মধ্যে মিথ্যা জ্ঞান রয়েছে, মানচরিত বা অভিমানী, লোভী, অলস, একচিন্তাকারী এবং মুর্খ ব্যক্তি। এই আট প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে সেই আলচনাটা ফল প্রসু হয় না।কারণ রাগীব্যক্তি রাগবশত, দ্বেষচরিত ব্যক্তি দ্বেষবশত, মোহচরিত ব্যক্তি মোহবশত বা আজ্ঞান বশত, মানচরিত ব্যক্তি মানবশত, লোভীব্যক্তি লোভবশত, অলস ব্যক্তি তার আল্যসের কারণে, একচিন্তা কারি ব্যক্তি একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে এবং মূর্খ ব্যক্তি তার মূর্খতার জন্য আলচনার মূল অর্থ নষ্ট করে।এই জন্যই এই আট প্রকার ব্যক্তিকে মন্ত্রণার অর্থ বিনাশকারী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।সুতরাং বলা যায় যে বাদের ক্ষেত্রে স্থান যেমন গুরুত্ব পূর্ণ তেমনি ব্যক্তিও গুরুত্ব পূর্ণ।তবে এই তিনটি বিষয় বলাই যথেষ্ট নয়, কোন উপায়ে আলোচনাটা অগ্রসর হবে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।বৌদ্ধশাস্ত্রে বাদের ক্ষেত্রে যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তা মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের নামকরণ হতেই বোঝা যায়, যেখানে রাজা মিলিন্দ এক এক করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এবং

অন্যদিকে ভিক্ষু নাগসেন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে এই আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাছেন।তবে জয়লাভ বা পরাজিত হওয়ার কোনো অবকাশ এখানে থাকে না। কারণ রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনের কাছে যাচ্ছেন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করার জন্য তাই জিজ্ঞাসু ও জানার ইচ্ছাটাই এখানে প্রাধান্য। জয়লাভ করা বা পরাজিত করা এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়।রাজা মিলিন্দের মনে বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ব বিষয়ে যে সমস্ত সংশয় জেগেছিল এবং যা নিরসনের জন্য তিনি বিভিন্ন ভিক্ষুর কাছেও আগে গেছিল অথচ সফল হন নি সেই সমস্ত উত্তরের আশায় তিনি ভিক্ষু নাগসেনের কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

তাছাড়া মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের 'মীমাংসা প্রশ্ন', নামক বর্গে বাদ-বিচারের একটি আলাদা রূপ দেখতে পাই।[1] আমরা জানি প্রাচীন কালে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত হতেন; কিন্তু সেই শাস্ত্র আলোচনা কিভাবে হবে এবং কারা সেই শাস্ত্র আলোচনায় আংশ নেবে তাঁর একটা স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে সব বিষয়ের আলোচনা সকল ব্যক্তির সাথে একই ভাবে করা যায় না। তাঁর জন্য মীমাংসাপ্রশ্নে বিচারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে,যথা-

[1] ঐ, পৃ ২৪-২৫।

১. দুজন অসম ব্যক্তির মধ্যে অর্থাৎ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাধারন ব্যক্তির; যেমন- রাজার সাথে পণ্ডিত ব্যক্তির আলোচনা।এবং

২. দুজন সমক্ষমাতা সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে পণ্ডিত ব্যক্তির আলোচনা।এই দুই ধরণের আলোচনার মধ্যে পার্থক্য আছে।কারণ পণ্ডিত গণ যখন শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হন তখন একজন পণ্ডিত অপর একজন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করে মূল তত্ত্বকে প্রতিষ্টা করার চেষ্টা করেন; এই পক্ষ-প্রতিপক্ষ খণ্ডনে ভয়ের কোনো আশঙ্কা থাকে না; এখানে উভয় পক্ষই খোলা মনে আলোচনা করতে পারে।কিন্তু যখন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা (রাজা) কোন বিষয় নিয়ে আলচনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁরা সেই বিষয়ে কিছু পূর্ব স্বীকৃতি ধরে নিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং এই পূর্ব স্বীকৃত বিষয়ের যিনি খণ্ডন করেন তাকে দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করা হয়। ফলে অপর পক্ষের মনের মধ্যে একটা ভয়ের আশঙ্কা কাজ করে, যার জন্য অপর পক্ষ খোলা মনে আলোচনা করতে পারে না এবং বিচারের যে মুল উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণন তা প্রতিষ্টিত হয় না।সুতরাং কোন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা হছে, সেই ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার স্বরূপ বা প্রকৃতি যে পাল্টে যায় তার একটা স্পষ্ট রূপ রেখা আমরা এই গ্রন্থে পাই, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

মিলিন্দপ্রশ্নে নাগসেন, বাদের স্বরূপ ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে শুধু আলোচনাই করেননি, তিনি নিজেও রাজা মিলিন্দের সাথে সংলাপে জড়িত হয়েছিলেন।এই রূপ সংলাপ বা কথোপকথনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এক প্রকার যুক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন যেটা আধুনিক পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে সাদৃশ্য ভিত্তিক যুক্তি নামে পরিচিত।এই সাদৃশ্যভিত্তিক যুক্তির সাধারন রূপটি হল-

a,b,c,d all have the property of P and Q.

a,b,c all have the property R.

Therefore, d probably has the property of R.

এই গ্রন্থের সমস্তটা জুরেই এই সাদৃশ্যভিত্তিক যুক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।এখন আমরা এই ধরণের কিছু যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব, যা এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়।"প্রত্যেক ব্যাক্তিই তাদের অতীত কর্মের ভিন্নতার জন্য একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, কেউ অল্পায়ুযুক্ত, কেউ বা দীর্ঘায়ুযুক্ত, কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ রোগযুক্ত ইত্যাদি" এই অবধারণটিকে নেওয়া যাক।কেন তাঁদের মধ্যে এই ভিন্নতা।[1] এই যুক্তিটিকে নাগসেন এভাবে উপস্থাপন করেছেন

[1] ঐ, পৃ ৫৯।

যে, ‘গাছেরা একে অপরের থেকে ভিন্ন কিছু গাছ লম্বা, কিছু গাছ অম্ল যুক্ত, কিছু গাছ কষায় যুক্ত, কিছু গাছ মধুর রস যুক্ত’- এর কারণ হচ্ছে বীজের ভিন্নতা অর্থাৎ বীজগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্যই সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত গাছগুলির মধ্যে ভেদ দেখা যায়।অপর দিকে প্রতিটি মানুষই জীবিত থাকা কালীন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে এবং সেই কর্মফল ভোগের জন্যই মানুষ ভবিষ্যতে আবার জন্ম গ্রহণ করে।সুতরাং এথেকে বলা যায় যে, নিজ নিজ অতীত কর্মের জন্যই মানূষ জন্ম গ্রহণ করে থাকে এবং সেই অতীত কর্মের মধ্যে ভেদ থাকার জন্যই সকল মানুষ সমান নয়। যুক্তির আকারটিকে এভাবে সাজানো যায়-

১. গাছ ও মানুষ উভয়ই কারণ জাত এবং তারা উভয়ই একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

২. বীজের(কারণ) ভিন্নতার জন্য গাছগুলি একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

অতএব কারণের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে (মুলত প্রত্যেক ব্যক্তির অতীত কর্মের ভিন্নতার জন্য) ব্যক্তির ভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করা গেল।

অপর দিকে যৌক্তিক আলোচনার একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল 'উভয় সংকট বা Dilemma',যা মিলিন্দপ্রশ্নের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।যার দৃষ্টান্ত আমরা **মেণ্ডকপ্রশ্ন** নামক অধ্যায়ে পেয়ে থাকি। এই আলোচনায় যাওয়ার আগে 'উভয় সংকট বা Dilemma' বলতে আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞানে কি বোঝায় তা যেনে নেওয়া দরকার।সাধারণ ভাবে আমরা বলতে পারি যে,যখন কোনো ব্যক্তিকে দুটি বিকল্পের মধ্যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে বলা হয়,যে বিকল্প দুটিই ঐ ব্যক্তির পক্ষে অপ্রীতিকর বা কষ্ট দায়ক।তখন সেই ব্যক্তিটি উভয় সংকটে আছেন।উভয় সংকট হল এমন এক যুক্তির আকার যেখানে এক পক্ষ,অপর পক্ষকে সেই অবস্থায়(উভয় সংকট) ফেলে দেয়। বাদের ক্ষেত্রে, এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে কিছু বিকল্প উপস্থাপন করে এবং সেই বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নিজের ইচ্ছে মতো একটিকে গ্রহণ করতে বলে এবং সেই বিকল্পটিও যখন টিকে না তখন প্রতিবাদী একটি অগ্রহণ যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনিত হন।[1] এখন আমরা মিলিন্দপ্রশ্নে উল্লেখিত এরকম কিছু উভয় কোটিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।যেমন এক্ষত্রে একটি দৃষ্টান্ত হল বুদ্ধ পূজার প্রসঙ্গ।[2]সেখানে বলা হচ্ছে 'বুদ্ধ পূজা সফল কিনা?'- কারণ সকল বৌদ্ধই বুদ্ধকে পূজনীয় ব্যক্তি বলেই মনে করেন।পূজা করাটা একটা সফল বিশ্বাস।কিন্তু এই

[1] I. M. Copi, Introduction to Logic, Pearson, South Asia, 2011, p. 213.

[2] মহাস্থবির, ধর্মাধার শ্রীমৎ পণ্ডিত, *মিলিন্দপ্রশ্ন*, বঙ্গানুবাদ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩,পৃ ৯৪.

বুদ্ধ পূজা স্বীকার করলে এখানে একটা উভয় সংকট দেখা দেবে।এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে একটা পূর্বস্বীকৃতি কাজ করে,সেই পূর্বস্বীকৃতিটা হল 'পূজা করলে তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা কিছু না কিছু দান করে থাকি,যেমন-ফুল,ফল,খাদ্য,বস্ত্র ইত্যাদি এবং ওই দান যদি তিনি গ্রহণ করেন তাহলে সেই পূজা সফল হয়েছে এরূপ মনে করে থাকি'।কিন্তু বুদ্ধ পূজার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা দেখা যায় না,তাই বুদ্ধ পূজা সফল নয় –এটাই বলতে হয়।যুক্তিটিকে এভাবে বলা যায়-

১. বুদ্ধ স্বয়ং যদি এই পূজা গ্রহণ করেন তাহলে তিনি কখনো পরিনির্বাণ লাভ করতে পারেন না,কারণ এই পূজা গ্রহণের জন্য তাঁকে জগতের কোথাও না কোথাও বিদ্যমান থাকতে হবে।

২. যদি তিনি এই জগতের কোথাও বিদ্যমান থাকেন এবং পরিনির্বাণ লাভ না করেন তাহলে তিনি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই এই জগতে বিদ্যমান।

৩. যদি তিনি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই হন তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যে কৃত পূজা নিস্ফল বা অর্থহীন।কারণ সাধারণ মানুষকে আমরা পূজা করি না।

সুতরাং বুদ্ধ পূজা সফল নয়।অন্যদিকে,

৪. যদি বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করে থাকেন তাললে তিনি এই জগতের সঙ্গে কোনো ভাবেই যুক্ত নন,ফলে তাঁর উদ্দেশ্যে দান করা ফুল ও ফল তিনি গ্রহণ করবে না।

৫. যিনি কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না তাঁর উদ্দেশ্যে দান করা অর্থহীন।

৬. তাই বুদ্ধ যদি তাঁর উদ্দেশ্যে করা দান গ্রহণ না করেন তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যে পুজা করা অর্থহীন।

৭. সুতরাং বুদ্ধ পূজা সফল নয়।

এই যুক্তিটি একটি Destructive Dilemma-এর স্বচ্ছ উদাহরণ, যেখানে প্রতিপক্ষকে দুটি কোটি মধ্যবর্তী স্থানে রাখে।প্রত্যেকটি কোটিই শেষ পর্যন্ত তাকে এমন একটি পরিস্থিতিতে নিয়ে যায় যা তার মূল সিদ্ধান্তের(assumption) বিরোধী।যদি আমরা এই যুক্তিটির একটি যৌক্তিক আকার দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে তার আকারটি হবে-

Basic assumption A.

১. If P then non A and if non P then non A.

২. P or non P.

Therefore, non A.

SO, A cannot be accepted.

আধিবিদ্যক বিষয়ক আলচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা প্রথমেই এই গ্রন্থে উল্লেখিত আত্মা সংক্রান্ত আলোচনার উল্লেখ পাই। কেননা ব্যক্তি বা আত্মা বিষয়ক আলোচনা এই গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মানুষ সভ্য হওয়ার সাথে সাথে চিন্তা করতে শুরু করলো যে মৃতুর পর আদৌও কোনো কিছুর অস্থিত থাকে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে মানুষ দেখলো যে মৃতুতেই সব কিছুর শেষ নয়,কারণ মৃতুর পর মানুষ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে থাকে।কিন্তু এখন প্রশ্ন হল কে এই পুনর জন্ম গ্রহণ করে? এর উত্তরে বলা হল 'আত্মা' জন্ম গ্রহণ করে থাকে এবং এই আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু এই আত্মা সম্পর্কে দার্শনিক মহলে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেননা কেউ বলেন আত্মা আছে আবার কেউ বলেন আত্মা বলে কিছু নেই।সাধারনত মানুষ মনে করেন যে, তার একটা দেহ আছে এবং সেই দেহটা অন্যান্য জড় বস্তুর অনুরূপ;

কিন্তু দেহ ছাড়াও এমন কি আছে যাকে আমরা 'আমি' বলে অভিহিত করি।তাই বলতে হয় যে আমাদের মধ্যে দেহ অতিরিক্ত এমন একটা সত্তা আছে যার জন্য আমরা অনুভব, ইচ্ছা, জ্ঞান অর্জন ও পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে পারি। আর এই সত্তাটাই হল আত্মা বা পুদগল, যা দেহকে আশ্রয় করে থাকে।কিন্তু আমরা জানি বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা শব্দের অনুরূপ কোনো সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি।কারণ বৌদ্ধরা আত্মা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।বৌদ্ধমতে আত্মা একটি নাম মাত্র,যা পঞ্চস্কন্ধকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়।ভগবান বুদ্ধের দ্বিতীয় দেশনা 'অনাত্মলক্ষণসুত্র'[1] হতে জানা যায় যে শাশ্বত বলে কিছু নেই, পঞ্চস্কন্ধ নিয়েই জীবদেহ গঠিত । তাই বলা হয় যে পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, পঞ্চস্কন্ধের সমাহার-ই হল আত্মা।কিন্তু এখন প্রশ্ন হয় নামের সাথে ব্যক্তি বা পুদগলের সম্পর্কটা কী? যেহেতু একজন ব্যক্তিকে আমরা তার নাম দিয়ে চিহ্নিত কিরি এবং এই নামের মধ্য দিয়েই সেই ব্যক্তি অন্য সকল ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।এই যে দার্শনিক তত্ত্ব (অনাত্মাবাদ) তার স্পষ্ট একটা রূপরেখা আমরা পালি শাস্ত্র মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে পেয়ে থাকি। যে আলোচনাটা আর অন্য কোনো গ্রন্থে এই ভাবে বিশেষত দেখতে পাওয়া যায় না। রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনে এই তত্ত্বটি একটি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে,যা নিম্নে

[1] চৌধুরী, সুকোমল, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ১৯৯৭,পৃ. ৮০।

মিলিন্দপ্রশ্ন অবলম্বনে আলোচনা করা হল-আমরা জানি রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ব বিষয়ে জানতে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন।তাই তিনি ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত নানা রকমের প্রশ্ন করতেন।

মিলিন্দ-ভন্তে! আপনি কি প্রকারে জ্ঞাত হয়ে থাকেন?আপনার নাম–ই বা কি?নাগসেন- মহারাজ!আমাকে সবাই নাগসেন নামেই জানেন এবং নাগসেন বলে সম্বোধন করেন,তবে এই নাগসেন নামটি ব্যবহারের নিমিত্ত মাত্র,কারণ এখানে কোন পুদগল বা আত্মার উপলব্ধি হয় না।

মিলিন্দ- ভন্তে নাগসেন!পুদগল বা ব্যক্তি বলে যদি কোনো কিছু স্বীকার না করা হয়, তাহলে কে আপনাদের চীবর,খাদ্য,এবং রোগ প্রতিরোধের ঔষোধ দিয়ে থাকেন? কে এই খাদ্য ভোজন করে? কে শীল রক্ষা করে?; কে প্রাণী হত্যা করে? কে পরদ্রব্য চুরি করে? কে নির্বাণ লাভ করে? যদি ব্যক্তি বলে কিছু না থাকে।তাহলে বলতে হয় যে পাপ-পূর্ণ কর্ম বলে কিছু নেই,পাপ পূর্ণ কর্মের কোনো কর্তাও নেই,এবং সেই কর্মের ফলও নেই।আপনাকে কেউ যদি এখন হত্যাও করে তাহলে সেই হত্যা কারীও কেউ হবে না।আপনার আচার্য বলে কেউ নেই,উপাধ্যায় নেই এবং উপসম্পদাও নেই।আপনি নিজে স্বীকার করছেন যে আপনাকে লোকে নাগসেন বলে ডেকে থাকেন,তাহলে এখানে এই ‘নাগসেন’ কে? আপনার কেশ, লোম,নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস,বক্ষ বা কিডনি, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ,

প্লীহা, ফুসফুস, নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলী, পিত্ত, কফ, পূজ, রক্ত, ঘাম, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, সিকনি, লালা, মূত্র অথবা মস্তিষ্ক কি নাগসেন?

নাগসেন - না মহারাজ!

মিলিন্দ - ভন্তে! আপনার রূপ কি নাগসেন?

নাগসেন - না মহারাজ।

মিলিন্দ - বেদনা কি নাগসেন?

নাগসেন - না মহারাজ।

মিলিন্দ - সংজ্ঞা কি নাগসেন?

নাগসেন- না মহারাজ।

মিলিন্দ - সংস্কার কি নাগসেন?

নাগসেন - না মহারাজ!

মিলিন্দ - বিজ্ঞান কি নাগসেন?

নাগসেন - না মহারাজ।

মিলিন্দ - তাহলে রূপ,বেদনা,সংজ্ঞা,সংস্কার এবং বিজ্ঞান একসঙ্গে কি নাগসেন?

নাগসেন - না মহারাজ।

মিলিন্দ - তাহলে রূপ,বেদনা,সংজ্ঞা,সংস্কার এবং বিজ্ঞান এদের থেকে আলাদা কিছু কি নাগসেন?

নাগসেন—না মহারাজ।

মিলিন্দ - ভন্তে! আপনাকে প্রশ্ন করে করে আমি কিন্তু নাগসেনকে কোথাও পেলাম না।তাহলে নাগসেন শব্দিই কি নাগসেন? শেষ পর্যন্ত এখানে আমার সামনে বিদ্যমান এই নাগসেন কে? নাগসেন নেই –ভন্তে আপনার এই কথা মিথ্যা। উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা মিলিন্দ প্রথমত দেহের প্রত্যেকটি অংশ নিয়ে বিশেষত যেগুলি রূপ স্কন্ধের মধ্যে পড়ে তাদের মধ্য থেকে নাগসেনকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন এবং পরে তিনি চারটি নামস্কন্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং একই ভাবে এদের মধ্য থেকেও নাগসেনকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নাগসেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 'না' বলে থাকেন।[1] তাঁর মতে রূপ বা দেহ যদি আত্মা হয় তাহলে দেহরূপী আত্মা দেহ সম্বন্ধীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হত, কারণ দেহী মনে করতো আমার দেহ এরকম হোক বা সেরকম না হোক। কিন্তু তা হয় না। রূপ বা দেহ বিষয়ে

[1] Siderits, Mark, *Buddhism as Philosophy*, Ashgate Publishing Limited, UK,2007, p. 52.

আমাদের দুঃখ থেকেই যায়।দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়ার জন্য দেহী প্রতিমুহূর্তে দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়। তাই দেহ বা রূপ আত্মা হতে পারে না।অনুরূপ ভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়ায় তারাও দুঃখের অধীন হয়ে থাকে। অতএব এদের মধ্যে কোন একটিকে আত্মা বলা যায় না।[1] আবার পরবর্তীতে রাজা মিলিন্দ আরেকটি সম্ভবনা কথা বলেন, সম্ভবনাটি হল- রূপ,বেদনা,সংজ্ঞা,সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধ যৌথভাবে কি নাগসেন? কিন্তু নাগসেন একই ভাবে এই সম্ভনাটিকেও অস্বীকার করেন।[2] কেননা এই পাঁচটি স্কন্ধই কার্যকারণ নীতিজাত, তাই পাঁচটি স্কন্ধই অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখদায়ক আর যা দুঃখদায়ক তা পর-স্বভাব, আত্মার স্বভাব নয়। সুতরাং অনাত্মন্।[3] যেমন কেউ যদি বলে থাকে বেদনাই হল আমার আত্মা, তাহলে সে কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশশীল আত্মাকেই স্বীকার করে নিল। কেননা বেদনা সুখ, দুঃখ ও অদুঃখ-অসুখ ভেদে তিন প্রকারের হয়ে থাকে।এদের মধ্যে যখন একটি বেদনার অনুভব (উদয়) হয় তখন কিন্তু অপর দুই প্রকার বেদনার অনুভব হয় না। প্রত্যেক বেদনাই নিজেকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করে থাকে।যখন কোন বেদনার উৎপত্তি হয় তখন আমরা বলি যে আমার এরূপ

---

[1] সুকোমল, চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৮১।

[2] Mark Siderits, *Buddhism as Philosophy*, Ashgate Publishing Limited, UK,2007, p. 52.

[3] সুকোমল, চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৮০।

বেদনা উৎপন্ন হয়েছে। আবার সেই বেদনা যখন নিরূদ্ধ হয় তখনও আমরা বলি যে আমার ঐ বেদনা নিরূদ্ধ হয়েছে।এথেকে এটাই বলা যায় যে বেদনা উৎপত্তি-বিনাশশীল।সুতরাং বেদনা যদি আত্মা হয় তাহলে আত্মাকেও উৎপত্তি-বিনাশশীল বলতে হয়। কিন্তু কেউই আত্মাকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলেনা।তাই বেদনা আত্মা হতে পারে না। একই ভাবে অন্য স্কন্ধগুলিকেও জানতে হবে।[1] আবার তিনি এরূপ সম্ভবনাও প্রদর্শন করেন যে, এই পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত কনো কিছু কি নাগসেন? কিন্তু নাগসেন সেই একই ভাবে এই সম্ভনাটিকেও উড়িয়ে দেন। ফলে শেষ পর্যন্ত রাজা মিলিন্দ ধরে নিয়েছেন যে 'নাগসেন' একটা নিছক খালি শব্দ মাত্র, যার কোন অর্থ নেই।এখানে নাগসেনের অনুরূপ কিছু নেই, নাগসেন একটি নাম মাত্র। এই নামকরণ ব্যবহারের নিমিত্ত মাত্র।[2] তখন ভিক্ষু নাগসেন রাজা মিলিন্দকে উক্ত বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন কেন এই 'নাগসেন'নামটি ব্যবহারসিদ্ধ।

নাগসেন- মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়-কুমার, সুকোমল চেহারা আপনার, তাই মধ্যাহ্ন সময়ে তপ্ত ভূমি, উষ্ণ বালুকাতে পায়ে হেটে আসায় নিশ্চয়ই আপনার পা ব্যাথা করছে এবং শরীর বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

---

[1] ঐ.

[2] Mark Siderits, *Buddhism as Philosophy*, Ashgate Publishing Limited, UK,2007, p. 52.

মিলিন্দ - ভন্তে! নাগসেন আমি পায়ে হেটে নয়, রথে করে এখানে এসেছি তাই আমার শরীরের কোন ক্লান্তি নেই।

নাগসেন - মহারাজ আপনি দেখছি রথে করে এখানে এসেছেন, তাহলে সেই রথ কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি? - ঈশা কি রথ? দণ্ড কি রথ? অক্ষ, চক্র, পঞ্জর, রজ্জু, চাবুক কি রথ?

মিলিন্দ - না ভন্তে!

নাগসেন - ঈশা, দণ্ড, অক্ষ ,চক্র, পঞ্জর, রজ্জু, চাবুক একত্রযোগে কি রথ?

মিলিন্দ - না ভন্তে!

নাগসেন - ঈশা, দণ্ড, অক্ষ ,চক্র, পঞ্জর, রজ্জু, চাবুক ব্যতীত অন্য কিছু কি রথ?

মিলিন্দ - না ভন্তে!

নাগসেন - মহারাজ! আমি আপনাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেও রথ কি তার উত্তর পেলাম না। তবে রথ শব্দ মাত্রই কি রথ? আপনি যাতে করে এসেছে তাহলে সেটা কি? মহারাজ! আপনি মিথ্যা বলছেন যে, রথ নেই।

মিলিন্দ - ভন্তে! নাগসেন আমি মিথ্যা বলিনি, ঈশা,দণ্ড ,চক্র,পঞ্জর,রজ্জু,চাবুক ইত্যাদির সমাহার-ই হল রথ।'রথ' একটি সংজ্ঞাবহ, ব্যবহারিক নাম মাত্র যা ঈশা,দণ্ড,চক্র ইত্যাদিকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়।

নাগসেন - সাধু, সাধু মহারাজ! রথ কি তা আপনি ভালোই জানেন।এই প্রকারেই মহারাজ কেশ, লোম ইত্যাদিকে আশ্রয় করে এই 'নাগসেন' নামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।কিন্তু পরমার্থ হিসাবে এখানে কোন পুদ্গল বা আত্মার উপলব্ধি হয় না।

মিলিন্দঃ- সাধু, সাধু ভন্তে! অতি বিচিত্র উপায়ে আপনি আমার আত্মা বিষয়ে চক্ষু দান করলেন।

আসলে আত্মা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে কীভাবে সৃষ্টি হয় তা এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে-যখন আমরা কোনো গাছের ছায়ায় বসি তখন আমরা ছায়াটাকেই গাছ বলে মনে করি কিন্তু ছায়াটা তো গাছ নয়।তাই বলতে হয় যেমন করে গাছের ছায়া গাছের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে আমরা ছায়াকে গাছের সাথে এক করে দেখি,তেমনি স্কন্ধগুলিকেও আমরা আত্মার সাথে এক করে দেখি। অর্থাৎ আমরা মনে করি পঞ্চস্কন্ধগুলি আত্মাতে আশ্রিত (belong করে)।তার কারণ হচ্ছে আত্মাকে আমরা প্রসূত ভাবিনা।এইরূপ ভ্রান্তি আমাদের

মধ্যে সর্বদা হয়ে থাকে।যার জন্য আমরা পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত এক সত্তাকে স্বীকার করে থাকি।আর এরূপ ভ্রান্তিকেই পাশ্চাত্য দার্শনিক Gilbert Ryle তাঁর *The Concept of Mind* নামক গ্রন্থে 'শ্রেণী বিভ্রান্তি' বা 'Category Mistake' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে,মানব জীবনের অনেক ঘটনা বলিকে আমরা একই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে থাকি যদিও তারা একই শ্রেণীভুক্ত নয়।যেমন ধরা যাক –একজন ব্যক্তি প্রথমবারের মতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এলেন এবং তাঁকে এক এক করে দর্শন ভবন, নজরুল ভবন, গান্ধী ভবন,গ্রন্থগার,খেলার মাঠ প্রভৃতি দেখানো হল কিন্তু তার পরেও যদি সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়? তখন তাকে বলতে হয় যে, দর্শন ভবন, নজরুল ভবন, গান্ধী ভবন,গ্রন্থগার,খেলার মাঠ প্রভৃতির মত তিনি যা কিছু দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তাদের অনুরূপ বা সমজাতীয় কিছু নয়, তিনি এতক্ষন পর্যন্ত যা কিছু দেখেছেন তাদের সব কিছুকে নিয়েই হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।সুতরাং একথা বলতে হয় যে দর্শন ভবন, নজরুল ভবন, গান্ধী ভবন,গ্রন্থগার,খেলার মাঠ প্রভৃতি যে ভাবে শ্রেণীভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেই একই শ্রেণীভুক্ত করে তিনি ভুল করেছিলেন।[1]

[1] Ryle, Gilbert, *The concept of Mind,* Penguin Books Ltd, New York, 1949, p. 18-19.

এই উপরি উক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত ব্যক্তি বলে কিছু নেই, ব্যক্তি হল পঞ্চস্কন্ধের সমাহার।

তবে অদিবিদ্যক আলোচনার মধ্যে কেবল আত্মা বিষয়ক আলোচনাই এখানে প্রাধান্য পাই নি তার সাথে সাথে এই অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিগনিত হয়েছে। যে আলোচনাটা এই গ্রন্থটিকে একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিত অর্থাৎ তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন রকম আলোচনা হতো।যেমন- তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কা, তিনি অনুত্তর(শ্রেষ্ঠ) কিনা, তিনি সর্বজ্ঞ কিনা, তিনি বিদ্যমান কিনা এবং যদি বিদ্যমান হন তাহলে তিনি কীরূপে বিদ্যমান ছিলেন প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থটিকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। যে আলোচনা গুলি আর অন্য কোনো পালি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

1. **বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কাঃ**- ভগবান বুদ্ধ আদৌও এই জগতের সাথে যুক্ত ছিলেন কিনা? এরূপ প্রশ্নের সম্মুখিন ভিক্ষুরা মাঝে মধ্যেই হতেন এবং উত্তর জ্ঞাত না থাকার কারণে বিচলিত হয়ে পরতেন।কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দেওয়া যায় তাঁর একটি দৃষ্টান্ত এই আধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।রাজা মিলিন্দ এখানে নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করছেন, ভন্তে নাগসেন! আপনি এবং আপনার আচার্যগণ কেউই বুদ্ধকে দেখেন নাই, তাহলে মানতে হয় যে ভগবান বুদ্ধ ছিলেন না। এর

উত্তরে নাগসেন একটি উপমা প্রয়োগ করে বলেন, মহারাজ! আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষগণ 'উহা' নদী দেখেন নি, তাহলে বলতে হয় যে উহা নদী নেই, অথচ হিমালয় পর্বতে উহা নদী বিদ্যমান। এই প্রকারেই মাহারাজ যদিও আমি কিংবা আমার আচার্যগণ ভগবান বুদ্ধকে দেখেন নি, তথাপি তিনি ছিলেন এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে।[1] অর্থাৎ এখানে নাগসেন বলতে চাইছেন যে, আমাদের দেখার উপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করেনা। কেননা এই পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলিকে আমরা কোন দিন দেখে উঠতে পারিনি অথচ আমরা তাদের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার করি।যেমন উহা নদীকে আমরা কখনো দেখিনি কিন্তু তাঁর অস্তিত্বে আমরা কোন সন্দেহের অবকাশ করিনা।সুতরাং বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের দেখার উপর নির্ভরশীল নয়।

২. **বুদ্ধ অনুত্তরঃ**- ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ট কিনা এই নিয়েও সন্দেহ দেখা যায়। যেমন রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে প্রশ্ন করছেন ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর কি? উত্তরে নাগসেন বলেন মহারাজ ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর বা শ্রেষ্ট ছিলেন।পুনরায় রাজা বলেন,ভন্তে নাগসেন! যে বুদ্ধকে আপনি কিংবা আপনার আচার্যগণও দেখেন নাই, সেই বুদ্ধ অনুত্তর কিনা তা আপনি কি করে বলতে পারেন? তখন নাগসেন এর উত্তরে বলেন যে,যারা এখনো পর্যন্ত মহাসমুদ্র দেখেনি কিন্তু সমুদ্র বিশাল বিস্তৃতি

[1]ধর্মাধার, মহাস্থবির শ্রীমৎ পণ্ডিত, *মিলিন্দপ্রশ্ন*, বঙ্গানুবাদ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৫।

সম্পন্ন, গভীর,অগাধ এবং যেখানে গঙ্গা, যমুনা,অচিরবতী,সরভূ ও মহী এই পঞ্চ মহানদী গিয়ে সর্বদা পতিত হয়েছে তাই সমুদ্র এরকম ধারণা তাদের মধ্যে আছে।এই প্রকারেই মহারাজ নির্বাণ প্রাপ্ত বড় বড় শিষ্যগণকে দেখে বলা যায় যে ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর বা শ্রেষ্ট ছিলেন।[1]

৩. **বুদ্ধের অনুত্তরত্ব সম্বন্ধে জানাঃ**- রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করছেন ভন্তে! নাগসেন আপনি বললেন যে, বুদ্ধ অনুত্তর কিন্তু সেই অনুত্তরত্ব জানা যায় কি? যদি জানা যায় তাহলে সেই উপায় আমাকে নির্দেশ করুন।এর উত্তরে ভিক্ষু নাগসেন একটি উপমাদৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে বললেন মহারাজ অতীত কালে তিষ্য নামে এক বিখ্যাত লেখকাচার্য ছিলেন এবং তিনি বহু বৎসর পূর্বে মারা গেছেন কিন্তু তাঁর লেখার দ্বারা তাঁকে মানুষ জন এখনো জানে থাকেন।অনুরূপ ভাবে যিনি ধর্মকে দেখেছেন তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখেছেন কারণ ভগবান বুদ্ধই ধর্মোপদেশ করেছেন।[2]

৪. **বুদ্ধের বিদ্যমানতাঃ**- রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে প্রশ্ন করছেন ভন্তে! ভগবান বুদ্ধ ছিলেন কি? আর যদি তিনি থেকে থাকেন তাহলে তিনি এখানে বা সেখানে আছেন তা আপনি দেখাতে পারেন কি? এর উত্তরে নাগসেন বলেন মহারাজ!

---

[1] ধর্মাধার, মহাস্থবির শ্রীমৎ পণ্ডিত, *মিলিন্দপ্রশ্ন*, বঙ্গানুবাদ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৫।
[2] ঐ, পৃ. ৬৫।

ভগবান বুদ্ধ ছিলেন। তবে তিনি এখানে বা সেখানে আছেন তা নির্দেশ করে দেখানো যায় না কারণ তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন, যার পর ব্যক্তিত্বের আর কোনো নিদর্শন থাকে না। প্রজ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের যে শিখা নির্বাপিত হয়েছে সেই শিখা এখানে বা সেখানে আছে তা যেমন দেখানো যায় না তেমনি যিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি এখানে বা সেখানে আছেন তা দেকানো যায় না। তবে ধর্মকায় দ্বারা কিন্তু ভগবান বুদ্ধকে প্রদর্শন করা যায়, যেহেতু ধর্ম ভগবান বুদ্ধ কতৃক দেশিত হয়েছে।[1]

৫. **বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শীঃ**- রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করছেন, ভন্তে! নাগসেন আপনারা বলে থাকেন যে ভগবান বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হন তাহলে কেন তিনি তাঁর সমস্ত শিক্ষা শিষ্যদের প্রতি একসঙ্গে প্রদান না করে, ক্রমান্বয়ে৷ প্রদান করেছিলেন? এর উত্তরে নাগসেন উপমাদৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, একজন বৈদ্য বা চিকিৎসক রোগীকে তখনি ঔষধ সেবন করান যখন রোগীর কোন রোগ ধরা পড়ে। তেমনি ভগবান বুদ্ধও সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শিষ্যদের নিমিত্ত কোন শিক্ষা বা

[1] ঐ, পৃ. ৬৯।

বিনয় বিধি প্রনয়ন করতেন না, উচিৎ সময়েই কেবল তিনি এই শিক্ষা প্রনয়ন করতেন।[1]

৬. **বুদ্ধের মহাপুরুষ লক্ষণঃ**- বুদ্ধকে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত বলে আভিহিত করা হয়েছে।কিন্তু এটা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে একটা সংশয় দেখা দিবে।সংশয়টি এরূপ, যদি বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত হন তাহলে তাঁর মাতা-পিতাও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত হবেন, কেননা পুত্র নিজের মাতা-পিতার সদৃশ্য হয়ে থাকে ।অথচ তাঁর মাতা-পিতা সেইরূপ ছিলেন না,তাহলে তিনিও মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত হতে পারেন না।এই সংশয়টিকে নাগসেন একটি যুক্তি দিয়ে নিরসন করছেন এইভাবে, পদ্ম কাঁদা ও জলে জন্ম গ্রহণ করে এবং সেখানেই বেড়ে ওঠে অথচ পদ্ম কাঁদা ও জলের সদৃশ্য হয় না, এই প্রকারেই ভগবান বুদ্ধ বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত হলেও তাঁর মাতা-পিতা সেরূপ ছিলেন না।[2]

---

[1] ঐ, পৃ. ৭০-৭১।

[2] ঐ, পৃ. ৭১।

নীতিতত্ত্ব বা নীতিবিজ্ঞান শব্দটি একটি আচরণবিধি সহ এক গুচ্ছ নৈতিক আদর্শ সমন্বিত বিষয়কে প্রকাশ করে, যা একজন ব্যক্তির কর্ম-পন্থা নির্ণয় করে দেয়।বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই বিধিগুলি মূলত ব্রহ্মবিহার ভিত্তিক অর্থাৎ মৈত্রী (স্নেহ-ভালোবাসা-প্রেম-উদারতাপূর্ণ বন্ধুত্ব), করুণা (সহানুভূতি), মুদিতা (সহানুভূতির আনন্দ) এবং উপেক্ষা (নির্লিপ্তভাব বা মানবিক সাম্য) এই চার বিষয় সংযুক্ত, বলতে গেলে যথাযথরূপে নীতিগুলি পঞ্চশীল ও মধ্যমপন্থার অনুসরণে ও পালনে প্রতিষ্টিত।

এরূপ কিছু নৈতিক গুণাবলীর পরিচয় আমরা মিলিন্দপ্রশ্ন অনুসারে এই অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।নৈতিক গুণ সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে কুশল ধর্ম প্রশ্ন হল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।কুশল ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ দর্শনে চারটি গুণকে স্বীকার করা হয়েছে যথা–শীল, শ্রদ্ধা, স্মৃতি ও সমাধি।এই প্রতিটি কুশল ধর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে।এর পাশাপাশি আরো দুটি গুরুত্ব পূর্ণ গুণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেই দুটি গুণ হল –বীর্য ও প্রজ্ঞা।কারণ বীর্যরূপ গুণ কুশল ধর্ম প্রতিষ্টায় এবং প্রজ্ঞারূপ গুণ চরম সত্যের উপলব্ধিতে সাহায্য করে।তাই এই দুটি গুণের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে এই বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে। এই কুশল ধর্মগুলিকে কেন্দ্র করে বা পালনের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌচ্ছাতে পারে।

শীলঃ- সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্টাই হল শীল।শীলে প্রতিষ্টিত সাধক শীলকে আশ্রয় করে বা শীলের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে থাকা শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের ব্যাপক প্রসার ঘটান। যেমন একজন নগরশিল্পী নগর নির্মাণের জন্য প্রথমে সেই স্থানটিকে পরিষ্কার করান অর্থাৎ সেখানে যাকিছু আবর্জনা আছে সেই আবর্জনাগুলিকে দূর করে এবং মাটিকে সমতল করে তদানুযায়ী রাস্তা ও অন্যান্য নকশা তৈরী করে শেষে নগর নির্মাণ করেন।অর্থাৎ যেভাবে এই নগর নির্মাতা নগর তৈরীর ক্ষেত্রে সমস্ত আবর্জনা বা

যা কিছু নগর তৈরির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় সেগুলিকে সম্পূর্ন ভাবে দূর করে যে জিনিস গুলো তার নগর নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক সেগুলোর বৃদ্ধি ঘটান তেমনি যোগী শীলকে আশ্রয় করে তার মনের মধ্যে থেকে কুচিন্তা গুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে বাকি ইন্দিয়গুলির (শ্রদ্ধা ,বীর্য ,স্মৃতি ,সমাধি ও প্রজ্ঞা) বৃদ্ধি ঘটান।[1]

বৌদ্ধদর্শনে সাধারণত তিন প্রকার শীলের কথা বলা হয়েছে, যথা- পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং দশশীল।পঞ্চশীল সাধারণত গৃহীদের জন্য, যথাঃ প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকা, কামবিষয়ে মিথ্যাচার হতে বিরত থাকা, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা এবং মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকা। অষ্টশীল উপাসক ব্রতধারীদের জন্য নির্দিষ্ট যথা- প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকা, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা, মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকা, অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকা, বিকাল ভোজন হতে বিরত থাক, নাচ-গান ও অশ্লীল দর্শন হতে বিরত থাকা এবং মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন হতে বিরত থাকান। দশশীল প্রব্রজিত শ্রামণেরগণের জন্য নির্দিষ্ট যথা- প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকা, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা, মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরত

[1] Rhys, Davids, *The Questions of King Milinda,* Translated, Sacred Books of the East, Oxford, 1890, p. 35.

থাকা, অব্রহ্মচর্য হতে বিরত, বিকাল ভোজন হতে বিরত, নাচ-গান ও অশ্লীল দর্শন হতে বিরত থাকা, মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন হতে বিরত থাকা, উচ্চশয়ন ও মহাশয়ন হতে বিরত থাকা এবং জাত ও রূপ্রজত গ্রহণ হতে বিরত থাকা।

শ্রদ্ধাঃ- চিত্তের প্রসন্নতা সাধন ও উৎসাহ উৎপাদন হল শ্রদ্ধার লক্ষণ।অর্থাৎ আমাদের চিত্ত বা মনের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক বা বাধা আছে সেগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে (প্রসন্ন করে) মনে উৎসাহ উৎপাদন করা হছে শ্রদ্ধার কাজ।কিন্তু এখন প্রশ্ন হতে পারে চিত্তের প্রসন্নতা ও উৎসাহ উৎপাদন কিভাবে শ্রদ্ধার লক্ষণ হয়ে থাকে? এই বিষয় টিকে দুটি উপমার সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। যেমন – জলশোধক মণি (ফিটকারি) জলে নিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে থাকা শংখ-শৈবাল-পানা বিদুরিত হয়,কাদা তলিয়ে যায়,ফলে জল স্বচ্ছ, প্রসন্ন,নির্মল হয় তেমনি মনের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে বাধা সমূহ বিদূরিত হয় ফলে বাধাহীন চিত্ত স্বচ্ছ,প্রসন্ন ও প্রসান্ত হয়।এই জন্যই চিত্তের প্রসন্নতাকে শ্রদ্ধার লক্ষণ বলা হয়েছে।[1]

অন্যদিকে প্রবল বর্ষনের ফলে যখন নদী সমূহ পূর্ণ হয়ে প্রচণ্ড স্রোতের সহিত প্লাবিত হয় ,তখন নদী পার হওয়ার জন্য অনেক লোক এসে

[1] Ibid, P. 54 - 55.

উপস্থিত হয় নদীর তীরে। কিন্তু তাঁরা নদীর গভীরত্ব বা অগভিরত্ব না জানার জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নদীর তীরে অবস্থান করে যতক্ষন না অপর কোনো সাহসী ব্যক্তি সেই নদী পার করে।পরে কোনো সাহসি ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলে এবং সে তার নিজের সাহসের জেরে দৃঢ়ভাবে কোমর বেধে সাতার দিয়ে নদী পার করলে তাকে দেখে অন্য লোকেরাও সাহস করে নদী পার করতে থাকে । ঠিক তেমনি সাধক অপর যোগীদের চিত্তকে মুক্ত দেখে স্বয়ং সেই পদ প্রাপ্তির জন্য মনে প্রবল উৎসাহ লাভ করেন এবং পরিশ্রমও করেন।এই রূপেই মনে উৎসাহ উৎপাদন হল শ্রদ্ধার লক্ষণ।[1]

বীর্যঃ- উপস্তম্ভণ বা দৃঢ়ীকরণ হল বীর্যের লক্ষণ।এই বীর্যের জন্য দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশল ধর্মের পরিহানি (বাতিল/রদ) হয় না। যেমন-কোনো ব্যক্তির নিজ গৃহ পড়ে যাওয়ার মত উপক্রম হলে সেই ব্যক্তি অপর কোন কাষ্টখণ্ড দ্বারা স্তম্ভ বা খুটি দিয়ে থাকে যাতে সেই গৃহ পরে না যায়।তেমনি যাবতীয় কুশল ধর্মের পরিহানি যাতে না হয় সেই স্তম্ভ বা খুটির কাজটা বীর্য করে থাকে।বীর্যবান আর্যশ্রাবক পাপ ত্যাগ করেন, পূণ্য বৃদ্ধি করেন, দোষ যুক্ত বিষয় ত্যাগ করেন, নির্দোষ বিষয় গঠন করেন এবং সব শেষে পবিত্র ভাবে নিজের জীবন যাপন

[1] Ibid, p. 55-56.

করেন।[1] কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, ক্রম অনুযায়ি শ্রদ্ধার পরে তো স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ অথচ শ্রদ্ধার পরে বীর্য নিয়ে আলোচনা করা হল কেন? তার কারণ হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণের উপমায় আমরা দেখেছি –একজন ব্যক্তি তার সাহসের জোরে গভীরত্ব না জানা নদী পাড় করে কিন্তু সেই সাহস যাতে অবদমিত না হয় অর্থাৎ সেই উৎসাহ যাতে লোপ না পায় তার জন্য ব্যক্তিকে যথেষ্ট দৃঢ় হতে হয়। আর এই দৃঢ়ীকরণই হল বীর্য।অর্থাৎ ব্যক্তি তার মনের মধ্যে যে সংকল্প গুলি স্থির করেছে সেই সংকল্প গুলিকে অটুট রাখার জন্য দৃঢ়তা প্রয়োজন।

স্মৃতিঃ- যথার্থ স্মরণ ও উপগ্রহণ হল স্মৃতির লক্ষণ।কিন্তু প্রশ্ন হল কীরূপে যথার্থ স্মরণ ও উপগ্রহণ স্মৃতির লক্ষণ হয়ে থাকে? যথার্থ স্মরণ কথার অর্থ হল যা ঠিক তাকে ঠিক ভাবে মনে করা (তৎবতি তৎপ্রকারক জ্ঞান), কেননা আমাদের উৎপদ্যমান স্মৃতি পথে নানা রকম ধর্ম (কুশল-অকুশল,দোষযুক্ত-দোষযুক্ত,হীন-উত্তম) উৎপন্ন হয়। তাঁদের মধ্যে যা ঠিক তাকে ঠিক ভাবে জানা এবং যা ভুল তাকে ভুল ভাবে জানাই হল যথার্থ স্মরণ।অর্থাৎ যেটা আমাদের সেবনীয় ধর্ম সেটাকে সেবন করা এবং যেটা সেবনীয় নয় সেটাকে সেবন না করা –এইরূপে জানাই হল যথার্থ স্মরণ। যেমন – কোনো চক্রবর্তী রাজার ভান্ডাগারিক প্রতিদিন

[1] Ibid, p. 57.

রাজাকে তাঁর এতগুলি হস্তী,অশ্ব,রথ,পদাতিক সৈন্য,এত পরিমাণ সম্পত্তি আছে প্রভৃতি ঐশ্বর্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেন,তেমনি উৎপদ্যমান স্মৃতি কুশল-অকুশল ধর্ম সমূহকে স্মরণ করিয়ে দেন।[1]

অন্যদিকে উৎপদ্যমান স্মৃতি হিতাহিত ধর্ম সমূহের বিচার করে অহিতকর ধর্মগুলিকে পরিত্যাগ করে হিতকর ধর্মগুলিকে গ্রহণ করে।যেমন-কোনো চক্রবর্তী রাজার সেনাধ্যক্ষ রাজার হিত-অহিত বিষয় গুলি জানেন-এগুলি রাজার হিতকর,এগুলি অহিতকর;এই গুলি উপকারক, এগুলি অনুপকারক।এরূপ জেনে সেনাধ্যক্ষ অহিতকর বিষয় গুলিকে ত্যাগ করে, হিতকর বিষয় গুলিকে গ্রহণ করেন।তেমনি উৎপদ্যমান স্মৃতি হিতাহিত ধর্ম সমূহের বিচার করে থাকে।[2]

সমাধিঃ- সমাধির লক্ষণ প্রমুখ(প্রধাণ)যে সকল কুশল ধর্ম আছে সেই সকল ধর্মই সমাধি অভিমুখি, সমাধি প্রবন এবং সমাধির প্রতি অবনত হয়।যেমন-যখন কোনো রাজা চতুরাঙ্গিনী সেনার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন হস্তী,রথ,অশ্ব, এবং পদাতিক সমস্ত সেনাই রাজার দিকে অভিমুখ করে থাকে, রাজার দিকে মুখ নত করে থাকে বা তাঁর দিকে অবনত হয় এবং রাজাকে

[1] Ibid, p. 59.
[2] Ibid.

সামনে রেখে অগ্রসর হয়।ঠিক তেমনি যে সমস্ত কুশল ধর্ম আছে সেগুলি সমাধি প্রমুখ প্রবন ও সমাধির দিকে অবনত হয়।[1]

প্রজ্ঞাঃ- ছেদন ও প্রকাশন হল প্রজ্ঞার লক্ষণ।কারন প্রজ্ঞা মনের মধ্যে থাকা ক্লেশরাশিকে ছেদন করে বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে তুলে ধরে বা প্রকাশ করে।যেমন করে যবচ্ছেদকগণ বাম হাতে যব কল্যাণ ধরে ডান হাতে কাস্তে দিয়ে যব ছেদন করে ,তেমনি করে যোগী ব্যক্তি মনস্কার(বিবেচনা) দ্বারা মন গ্রহণ করে প্রজ্ঞা দিয়ে ক্লেশরাশি ছেদন করে।[2] অন্যদিকে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে অবিদ্যান্ধকার দূর হয় বিদ্যা-রূপী আলো উদ্ভাসিত হয়,জ্ঞানের আলো বিকশিত হয় ও আর্য সত্য সমূহ প্রকটিত হয়।ফলে যোগীব্যক্তি প্রজ্ঞা দ্বারা 'অনিত্য', 'দুঃখ', ও 'অনাত্ম' বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করে।যেমন – কোনো ব্যক্তি যখন অন্ধকার ঘরে প্রদীপ নিয়ে প্রবেশ করে তখন সেই অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে ঘরের মধ্যে থাকা দ্রব্য সমূহকে প্রকাশিত করে।তেমনি প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে অবিদ্যা-অন্ধকার দূর করে বিদ্যার আলো উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোক বিকশিত করে,চারটি আর্য সত্যের

[1] Ibid, P. 60.

[2] Ibid, p. 61.

জ্ঞানকে প্রকট করে ।ফলে যোগী 'অনিত্য', 'দুঃখ', ও 'অনাত্ম' প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যক্ রূপে দর্শন করেন।[1]

নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা রূপে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আত্মপ্রকাশ, যেখানে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তঃবর্তী সম্পর্ককে ঘিরে বহু আলোচনা হয়ে থাকে।সাধারন ভাবে পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।আমাদের বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক এলাকাকে ঘিরে আমাদের সীমিত পরিবেশ।তেমনি বিভিন্ন ছোটো ছোটো পরিবেশ সামগ্রিক ভাবে মিলিত

[1] Ibid, p. 61-62

হয়ে এক বৃহদাকার পরিবেশের সৃষ্টি করে।পৃথিবীর পরিমন্ডলে আমাদেরকে ঘিরে আছে বিভিন্ন সজীব ও নির্জীব(জড়) পদার্থ।এই নির্জীব পদার্থের মধ্যে যেমন রয়েছে জল, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, তেমনি সজীবের মধ্যে রয়েছে মানুষ,পশু-পক্ষী,কীটপতঙ্গ,উদ্ভিদ-গুল্ম প্রভৃতি।এই সমস্ত নির্জীব ও সজীব পদার্থই হল পরিবেশের উপাদান।[1] পরিবেশ সম্পর্কে সাধারন মত প্রচলিত থাকলেও পরিবেশবিদগণ পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে-" কোনো জীবের চারপাশে জীবটির উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী সমস্ত সজীব ও জড়পদার্থের মোট যোগফলকে ঐ জীবেরে পরিবেশ বলা হয়।[2] এই বৃহদাকার পরিবেশকে ভারতীয় দর্শনে 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যেও দেখতে পাওয়া যায় যে এই প্রকৃতির সঙ্গেঁ মানুষের নিবিড় সম্বন্ধের কথাই বার বার তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মতে পরিবেশ বা প্রকৃতি মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়।"মানুষের জীবনের সঙ্গেঁ প্রকৃতির এক নিবিড় সংযোগ রয়েছে, প্রকৃতিও যে মানুষের সুখ-দুঃখে কাতর বা আনন্দিত হতে পারে তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন মেলে কালিদাসের রচনায়।আমাদের মনে পড়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের কথা,

[1] মুখোপাধ্যায়, এ ও আগরঅয়াল, এস. পি, *আধুনিক পরিবেশ বিদ্যা,* পারফেক্ট প্রিন্টেন্ডপ্রেসেস, কলিকাতা, ২০০০, পৃঃ ২।

[2] ঐ.

যখন শকুন্তলা তার চিরপরিচিত আশ্রম ছেড়ে দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে গমন করছে, তখন আশ্রমের মানুষদের ন্যায় আশ্রমের প্রাণীকূলও যেন সমভাবে কাতর হয়ে পড়েছে"। তবে প্রাচীনকাল থেকে প্রকৃতির স্বরূপ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যায়ীত হয়ে আসছে,যেমন- কখনো প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে ঈশ্বররূপে আবার কখনো জগতের স্বরূপ রূপে। প্রাচীন কালে মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হত প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই।কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ যখন নতুন জীবনশৈলী অনুশীলনে বা বিলাসবহুল জীবন যাত্রায় রত হন, তখনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা ব্যবধান(দূরত্ব) শুরু হয়।কেননা এই সময়ে এসে মানব সমাজ প্রকৃতিকে বস্তুরূপে ব্যবহার করতে আরম্ভ(শুরু) করে, আমরা মনে করি প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের ব্যবহারের নিমিত্ত মাত্র এবং এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের(পশু-পখী,গাছ-পালা) মূল্য নির্ধারিত হয় তারা মানুষের ব্যবহারে কতটুকু প্রয়োজন তার উপর নির্ভর করে।এই সমস্ত কারণে জন্য একটা সময়ে এসে মানবজাতি ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল।কিন্তু সম্পর্কের এই দৃঢ়তা শিথিল হলেও তা মানব মন হতে চিরতরে মুছে যায়নি, যার জন্য মানুষ পরবর্তী কালে যখন বুঝলো যে প্রকৃতির প্রতি শোষণ অনৈতিক,তখন থেকে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের সাথে যুক্ত হল নৈতিকতার মাত্রা।যাকে আমরা বর্তমানে 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' বা

'Environmental Ethics' বলে জানি।এই পরিবেশগত নীতিবিদ্যায় মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়জগত সমস্ত সত্তাকেই সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সকলের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং সকলের সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।সুতরাং "পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলতে আমরা সেই বিশেষ দৃষ্টিকোনের প্রতি আলোকপাত করি যা মানুষকে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়"।[1]এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক মাধবেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা খুবেই প্রাসঙ্গিক।তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "আমরাই এই গ্রহের একমাত্র বাসিন্দা নই, 'অন্য'রাও আছে"। এই অন্যদের কাছে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী।এই ঋণ আমাদের বিনীতভাবে স্বীকার করতে হবে।আমাদের এই 'অন্য'দের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে, তাদের স্বগতঃ মূল্যের স্বীকৃতি দিতে হবে।কিন্তু তাদের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করলে সেই মর্যাদা বা মূল্য দেওয়া হয় না।[2]

সাধারণভাবে যাকে আমরা পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলে থাকি, সেই পরিবেশ নিতিবিদ্যার একটি ইতিহাস আছে।আমরা যদি পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রের উন্নতিক্রম লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে 'নীতিশাস্ত্র' কথাটি সর্ব প্রথম মানুষের

[1] রায়, পারমিতা, 'জৈন দর্শনে পরিবেশ ভাবনা', *তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বালী, ২০১৭।

[2] মিত্র, মাধবেন্দ্রনাথ, 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিষয়ক একটি দার্শনিক আলোচনা', *তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বালী, ২০১৭, পৃঃ ৩৮।

জন্যই তৈরি হয়েছিল,অর্থাৎ মানুষের স্বার্থেই নৈতিক নীতিগুলিকে একটি শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।যা বর্তমানে সনাতনি বা গতানুগতিক নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত।এই গতানুগতিক নীতিবিদ্যা মানুষের ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব,ন্যায্যতা-অন্যায্যতা প্রভৃতি।যেমন-মিলের উপযোগবাদে কোনো কাজের মূল্য নির্ধারিত হয় সেই কাজের ভালত্ব বা মন্দত্বের উপর নির্ভর করে (greatest happiness of the greatest number),অর্থাৎ যদি কাজটি বেশি সংখ্যক মানুষের সুখ উৎপাদন করে তবে কাজটি ভালো,নচেত নয়।তাই বলা যায় যে,গতানুগতিক নীতিবিদ্যা সম্পূর্ণ মনুষ্যকেন্দ্রিক(Anthropocentric)। কিন্তু এই মনুষ্যকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যায় মনে করা হয় যে, মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যই মুখ্য, আর মানুষ ভিন্ন অর্থাৎ মনুষ্যতর প্রাণী ইত্যাদির প্রতি তা গৌণ।ফলে পাশ্চাত্য নীতিবিদগণ পরবর্তীকালে অপর একটি নীতিবিদ্যা প্রতিষ্টা করতে চাইলেন অথবা বলা যেতে পারে তাঁরা মানব সমাজ সম্বন্ধীয় নীতিশাস্ত্রের পরিধি বর্ধিত করতে সচেষ্ট হলেন।এই বর্ধিত স্থানে স্থান পেল সমস্ত অ-মানব প্রাণী।যাকে বর্তমানে প্রাণী নীতিবিদ্যা(Animal Ethics) নামে অভিহিত করা হয়েছে। মনুষ্যকেন্দ্রিক নৈতিকতার পরিধিকে বর্ধিত করা হলেও তাতে কিন্তু এক শ্রেণীর প্রজাতি এই নৈতিকতার পরিধি থেকে বাইরে রয়ে গেল।

যাদের মধ্যে রয়েছে গাছ-পালা,কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জড়বস্তু। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ যখন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারলো কিংবা পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হল তখন পাশ্চাত্য নীতিবীদগণ পরবর্তীকালে অপর আর একটি নীতিবিদ্যা প্রতিষ্টা করতে সচেষ্ট হন, যেখানে সকল সত্তাকেই(জীব,অজীব ও জড়) নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা হয়।যাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা (Environmental Ethics) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই পরিবেশ নীতিবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল পরিবেশের প্রতি মানুষের কীরূপ আচরণ হওয়া উচিৎ এবং কীরূপ আচরণ হওয়া উচিৎ নয় তা নিয়ে আলোচনা করা। কারণ অ-মানব সত্তা বা পরিবেশের প্রতি মানব জাতির কিছু দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে।এই যে 'দায়িত্ব বা কর্তব্য' তা ভারতীয় দর্শনে ঋণ নামে পরিচিত,যেমন 'ভূ-ঋণ'।তাছাড়া মানুষের মতই অ-মানব সত্তারও(নদ-নদী,পাহাড়-সমূদ্র,আকাশ-বাতাশ) নিজেস্ব কিছু মূল্য আছে এবং সকলেই নৈতিক মর্যাদার দাবীদার, যার জন্য আমাদের তাদের প্রতি সম্মান করা উচিৎ এবং তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত।সুতরাং বলা যায় যে মানুষ যেমন মানব প্রজাতিকে মূল্য প্রদান করবে তেমনি অন্যান্য অ-মানব সত্তার প্রতিও যত্নশীল হবে।কারণ আমাদের এই জীবন প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনকে কোনো ভাবেই অতিক্রম করা যায় না।খাদ্য থেকে শুরু করে বাসস্থান প্রভৃতির

জন্য আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এবং যার উপর নির্ভরশীল হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত আমদের জীবন অতিবাহিত করি তাকে রক্ষা করার দায়িত্বভার আমাদের উপরেই বর্তায় । তাই যে আচরণের দ্বারা প্রকৃতি বা পরিবেশের হানি ঘটতে পারে তেমন কোনো আচরণ আমাদের করা উচিৎ নয়। সুতরাং বলা যায় পরিবেশ মুলক নীতিবিদ্যা গতানুগতিক নীতিবিদ্যাকে প্রসারিত করে মানুষের কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছে যে, পরিবেশ হানিকর সকল কাজই হল নিন্দনীয় এবং পরিবেশের অনুকূল সকল কাজ প্রসংশনীয় যোগ্য।

তবে পরিবেশ সংক্রান্ত নৈতিক আলোচনা অত্যন্ত আধুনিক হলেও বৌদ্ধধর্মে বহু আগে থেকেই এই পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।বৌদ্ধধর্ম একটি পরিবেশগত ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ধর্ম, যার মধ্যে অনেক সমসাময়িক প্রকৃতি সংক্রান্ত উদ্বেগ বর্ণিত হয়েছে।যেমন প্রকৃতির সাথে মানুষের যে এক নিবিড় মিথস্ক্রিয়া সম্পর্ক বিদ্যমান এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার পারস্পারিক অন্তঃক্রিয়া মানবজাতির বিকাশে যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখে তা বুদ্ধের দেশনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।তার অন্যতম প্রতীক হল বুদ্ধের নিজের জীবন।কেননা বুদ্ধের জীবনের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেছে প্রকৃতির মধ্যে, বিশেষতঃ বৃক্ষের সান্নিধ্যে।যেমন – জন্ম (শাল গাছের নিচে), বোধিলাভ (বোধিবৃক্ষের নিচে), মহাপরিনির্বাণ লাভ(বট বৃক্ষের নিচে) ইত্যাদি।সুতরাং বলা

যায়, যার সমগ্র জীবনের ঘটনা নিবিড় ভাবে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত,তাঁর দেশনার মধ্যে পরিবেশগত নীতিধর্মের উল্লেখ থাকবে –এটা তো বলাই বাহুল্য। তবে নিজ বৈশিষ্ট রক্ষার জন্যই হয়তো অতীতে বৌদ্ধধর্মে পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র প্রনয়নের সামান্য কারণ ছিল। তার কারণ হিসাবে বলা যায়, সেই সময় মানুষ প্রকৃতির কোলেই বসবাস করত; অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই জীবন অতিবাহিত করত।তাই আধুনিক কালের মত পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য তেমন কোনো আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। কিন্তু আজ যখন প্রকৃতপক্ষে মানুষ পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে,তখন অনেক বৌদ্ধদার্শনিক পরিবেশগত এই সংকটের হাত থেকে মুক্তির জন্য বৌদ্ধ পরিবেশগত নীতিবিদ্যার রচণা করেছেন।যা বর্তমানে ‘Green Buddhism’ বা ‘সবুজ বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত লাভ করেছে।

তাছাড়া বৌদ্ধপরিবেশগত নৈতিকতার মূল নিহিত ছিল বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্বের মধ্যেই।আমরা জানি ভগবান বুদ্ধের প্রাথমিক দেশনাই হল ‘ধর্মচক্রপ্রবর্তনসুত্র’ যেখানে আমরা চারটি আর্য সত্যের উল্লেখ পাই;এই চতুরার্য সত্যের উপর ভিত্তি করেই সমগ্র বৌদ্ধ দর্শন দাড়িয়ে রয়েছে।এই চারটি আর্য সত্য হল- জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃতি সম্ভব এবং দুঃখ নিবৃতির উপায় আছে। সুতরাং এই চতুরার্য সত্য হতে একথা বলা

যায় যে, দুঃখটাই একমাত্র সত্য নয়, দুঃখ থেকে নিবৃতি হলো আমাদের মূল লক্ষ্য।[1] কিন্তু এই দুঃখ থেকে নিবৃতি লাভ কি করে সম্ভব?তার জন্য বৌদ্ধদর্শনে আটটি মার্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সেই আটটি মার্গ হল-

(১) **সম্যক্ দৃষ্টি**- সম্যক্ শব্দের অর্থ 'যথার্থ' এবং দৃষ্টি শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'।চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হল সম্যক দৃষ্টি।

(২) **সম্যক্ সংকল্প** –উত্তম সংকল্প;চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কারাই যথেষ্ট নয়,নিজের জীবনকে সেই জ্ঞান অনুযায়ী পরিচালনা করাও আবশ্যক।আবার ঈর্ষা,হিংসা,বিদ্বেষ,পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মানুষকে পশুতে পরিণত করে।এই সকল অশুভ এবং অকুশল চিন্তা বা সংকল্প পরিত্যাগ করে চিত্তে মৈত্রী,করুণা,পরোপকার চিন্তা,সৎচিন্তা,সদভাবনা ইত্যাদি জাগ্রত করার নামই হল সম্যক্ সংকল্প।

(৩) **সম্যক্ বাক্**- সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে।অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ,কটুবাক্য ইত্যাদি একান্ত ভাবে পরিহার করে সাধককে সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে।

---

[1] Martine. Batchelor and Kerry. Brown, *Buddhism and Ecology,* Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., First Indian Edition, Delhi, 1994, p. 32.

(৪) **সম্যক্ কর্মান্ত** –কাম,ক্রোধ,লোভ,মোহ,চোর্য,হিংসা ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অহিংস,মৈত্রী ও করুণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মসাধন করাই হল সম্যক্ কর্মান্ত।

(৫) **সম্যক্ আজীব**- সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ অর্থাৎ প্রবঞ্চণা,কপটতা প্রভৃতি উপায় বর্জন করে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনই হল সম্যক্ আজীব। প্রাণি হত্যা,মদ্য বিক্রয়,গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।

(৬) **সম্যক্ ব্যায়াম**- সৎ চিন্তা ও সৎ প্রবৃতির নিরন্তর অনুশীলনের চেষ্টাই হচ্ছে সম্যক্ ব্যায়ম।সম্যক্ দৃষ্টির আলোকে সঙ্কল্প,বাক,কর্মান্ত ও আজীব নিয়ন্ত্রিত হলেও বহুকালগত ও নবজাত অশুভ ভাবনা নির্বাণার্থীকে যথার্থ পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।কিন্তু নির্বাণার্থী যদি নিরন্তর চিন্তার দ্বারা অশুভভাবনা গুলিকে দূর করে শুভ ভাবনার বৃদ্ধি ঘটায় তাহলে নির্বাণার্থী দৃঢ়ভাবে নির্বাণ প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হতে পারে।

(৭) **সম্যক্ স্মৃতি**- বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকাই হল সম্যক্ স্মৃতি।নির্বাণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই জগতের কোন

কিছুই নিত্য নয়। এই বোধ বা স্মৃতি যদি সর্বদা জাগ্রত থাকে তাহলে জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আর আশক্তি থাকে না।

(৮) **সম্যক্ সমাধি**- উপরোক্ত সাতটি মার্গ সম্বন্ধে চিত্তের বা মনের একাগ্রতাই হল সমাধি। সমাধিতে সাধক প্রথমে শান্ত,আনন্দময় ও উদাসীন অবস্থায় অবস্থান করে;এবং পরে সাধক সর্বপ্রকার অনুভুতিবিহীন হয়ে আত্মসমাহিত হন।

এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ কে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা-প্রজ্ঞা,শীল ও সমাধি।এর মধ্যে শীল হছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্টাই হল শীল।এই শীলকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠেছে বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র।বৌদ্ধ দর্শনে বিভিন্ন প্রকার শীলের কথা বলা হয়েছে,যেমন-পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং দশশীল। তবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক শীলেই কোন না কোন পাপ কর্ম থেক বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শীল হল-প্রাণাতিপাত বিরতি অর্থাৎ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা।এই প্রাণাতিপাত বিরতিকেই বৌদ্ধদর্শনে 'অহিংসা' বলে জানা হয়।অহিংসার মূল কথাই হল যে কোন প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা। তবে কেবল প্রাণী হত্যাকেই হিংসা বলে ধরা হয়নি,প্রাণীর প্রতি আঘাত করা,প্রাণীর অনিষ্ট কামনা করাকেও হিংসা বলে গণ্য করা হয়েছে।অন্যদিকে প্রাণী বলতে শুধুমাত্র পশুপাখিকে বোঝানো হয়নি,পশুপাখি ছাড়াও অতিক্ষুদ্র

কীটপতঙ্গ,গাছপালা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।সুতরাং বলা যায় যে,যিনি প্রকৃত অহিংসক তিনি যে কেবল পশুপাখির প্রতি অহিংসক হবেন এমন নয়;তিনি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ,গুল্ম-লতা প্রভৃতিকেও পদদলিত করবেন না।তাঁদের মতে সকল প্রাণীর কাছেই তার নিজের জীবন প্রিয়, আমি যেমন আঘাত পেতে চাই না তেমনি অন্য কেউই আঘাত প্রাপ্ত হতে চায় না।সুতরাং আত্মপীড়ন যদি আকাম্য হয় তাহলে অপরকে পীড়া দেওয়াও একই ভাবে আমাদের অকাম্য।

অন্যদিকে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব হতেও পরিবেশ সংক্রান্ত নৈতিকতার আভাস পাই।এই তত্ত্ব আনুসারে জগতের প্রতিটি বস্তুই অপর কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে উৎপন্ন।অর্থাৎ জাগতিক প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এক পারস্পারিক নির্ভরশীলতা বর্তমান।এই পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তিনটি স্তরে উপলব্ধ হয়- (১) দেহ ও মনের স্তরে, (২) মানুষের স্তরে, (৩) মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর স্তরে। এই তৃতীয় প্রকার পারস্পারিক নির্ভরশীলতা থেকেই বৌদ্ধ দর্শনের পরিবেশ নীতিবিদ্যার সূচনা হয়।[1] কারণ জগতের প্রতিটি বস্তুই যদি অপর কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয় তাহলে এই উৎপত্তি ক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য জগতের প্রতিটি বস্তুর থাকা আবশ্যক। তাই মানুষ ও

[1] চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, 'পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ দর্শন', *তত্ত্ব ও প্রয়োগ* , ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বালী, ২০১৭, পৃ. ৭৫।

পরিবেশের এই আন্তঃসম্পর্ককে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা উচিৎ, নচেৎ ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন অরক্ষিত ও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এখন বুদ্ধের দেশনার মধ্যে কিভাবে আগে থেকেই পরিবেশ চেতনার মূল নিহিত ছিল তা দেখা যাক। ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন গাথায় উপদেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমরা সকলেই প্রকৃতির কাছে অপরিসীম ঋণী।একথা বলে তিনি কিন্তু তাঁর শিষ্যদের পরিবেশ ধ্বংসের থেকে নিবৃতি থাকার কথাই বলেছেন। কেননা তাঁর মতে,সজীব গাছ কেটে ফেলা,তার ডাল পালা কেটে ফেলা বা পাতা ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই ছিল 'প্রায়শ্চিত্তযগ্য অপরাধ'।

কেবল বৃক্ষই নয় সমগ্র প্রাণী জগতের প্রতি বুদ্ধ ছিলেন দয়াপরায়ণ।যার পরিচয় আমরা 'করণীয় মেত্তাসুত্তে' পাই।সেখানে বুদ্ধ সমস্ত প্রাণী জগতের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কথা বলেছেন।তাঁর মতে জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের কোমল হৃদয় বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারি।যেমন-ভালোবাসা,দয়া ইত্যাদি।এই জন্যই হয়তো বৌদ্ধধর্মের অনুগামীরা বিশ্বাস করতেন যে, যে কোনো প্রাণীর-ই সুখে ও স্বাধীন

ভাবে বাঁচার অধিকার আছে তা ছোটো বা বড় যে কোনো প্রাণীই হোক না কেন।[1]

বিনয় পিটক গ্রন্থের দিকে যদি চোখ রাখি তাহলে দেখব যে সেখানে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের কর্তব্য-আকর্তব্য নিয়ে বিবিধ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,বর্ষাকালে ভিক্ষুরা সংঘ-গৃহে বা বিহারে বাস করবেন,প্রব্রাজায় যাবেন না।কারণ প্রব্রাজায় যাবার সময় কাদায় পদপৃষ্ট হয়ে ছোটো প্রাণী,কীটপতঙ্গ মারা যেতে পারে অথবা কোন বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে শুধু নিষেধ করাই নয় জীব ও জগতের প্রতি মানুষের কি করণীয় তারও নির্দেশ দিয়েছেন।যেমন – জালে আবদ্ধ মাছ বা পশুপাখিকে মুক্ত করা ভিক্ষু মাত্রেরই কর্তব্য।

পশুপাখি,গাছপালা প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য পালন,তাঁদের প্রতি আমাদের যত্নশীল হওয়া এই উপদেশ গুলি যে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক মতবাদের গন্ডীর স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। তা যে বাস্তবে যথাযথ ভাবে পালিত হত তার পরিচয় আমরা সম্রাট অশোকের রাজ্যত্ব কাল হতে দেখতে পাই। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর আশোক তাঁর রাজ্য ছাগল,ভেড়া,শুকর প্রভৃতি প্রাণী হত্যা একে বারেই নিষিদ্ধ করে দেন এবং একই সঙ্গে মানুষ ও পশু উভয়ের জন্য কূপ খনন,বৃক্ষরোপন

[1] মেত্তসুত্র, সুত্তনিপাত, ভিক্ষুশীলভদ্র অনূদিত, পৃঃ ২২।

প্রভৃতির উপর জোর দেন।এমনকি অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসার জন্য পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্টা করেন।

বৌদ্ধদের যে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা যেমন প্রকৃতিকে আঘাত না করা, প্রকৃতিকে ধ্বংস না করা এটা যে শুধু মাত্র বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে এমন নয়,এর অনুরূপ কথা আমরা পাশ্চাত্যের পরিবেশগত নীতিবিদ্যাতেও দেখতে পাই। সুতরাং এদিক থেকে বৌদ্ধ পরিবেশগত নীতিবিদ্যার অভিনবত্ব কিছু নেই।কিন্তু পরিবেশের দিক থেকে বৌদ্ধদের যে অভিনবত্ব তা হছে তাঁরা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানুষের নৈতিক শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে দেখেছেন।তা গাছ-পালা, পাহার,পর্বত,সমুদ্র ইত্যাদি যাই হোক না কেন তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার সামর্থ রাখে।এদিক থেকে বৌদ্ধদর্শন আধুনিক পাশ্চাত্য পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবিদ্যার থেকে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে বলা যায়।কেননা পাশ্চাত্য পরিবেশবিদগণ পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলেন অথবা মনুষ্যেতর পশুপ্রাণীর প্রতি দয়া,মমতা প্রদর্শনের কথা বলেন কিন্তু কেউই তাঁদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে একথা বলেননি।এখানেই বৌদ্ধধর্মের অভিনবত্ব,যার উল্লেখ আমরা মিলিন্দপনহা নামক পালি শাস্ত্রে দেখতে পাই। সেখানে রাজা মিলিন্দ যখন ভিক্ষু নাগসেনকে জিজ্ঞেসা করেন যে কিভাবে এবং কোন কোন গুন বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে

একজন ভিক্ষু অর্হত্ব অর্জন করতে পারে,তখন ভিক্ষু নাগসেন তাঁর সামনে জীব ও জগতের ১০৫ টি বস্তুর উল্লেখ করেন,যার মধ্যে জীব ও অজীব উভয় ধরণের বস্তুই রয়েছে এবং বলেন যে এই সমস্ত বস্তু থেকে একজন ভিক্ষু তার নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষা নিতে পারেন;যাতে তার চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রকাশ ঘটে,তার দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধিত হয় এবং তার পক্ষে সর্বোচ্চ স্তর বা অর্হতের স্তরে পৌছানো সম্ভব হয়। যে ১০৫ টি বস্তুর তালিকা নাগসেন দিয়েছেন তার মধ্যে অতিক্ষুদ্র,তুচ্ছ বস্তু যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অনেক বড় বৃহদাকার বস্তুও । ***মিলিন্দপন্হা*** গ্রন্থের শেষ অধ্যায় উপমা কথার সমস্তটা জুরেই এই ১০৫ টি বস্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এদের থেকে একজন ভিক্ষুর কি কি শিক্ষণীয় আছে তা বর্ণনা করা হয়েছে।যেমন -

১. গর্ধভের এক গুণঃ – গর্দভ যাকে আমরা কোন গুরুত্বই দিই না,যাকে নিছক ভারবাহী,বোকা প্রাণী বলে তাচ্ছিল্য করে থাকি তার থেকেও আমাদের কিছু শেখার আছে বলে বলে মনে করেন নাগসেন।গর্দভ যেমন আবর্জনা স্তুপে,রাস্তাঘাটে,বাড়ির দরজা প্রভৃতির বাছবিচার না করে যে কোন স্থানে শয়ন করে কিন্তু সেখানেই সে নিদ্রামগ্ন হয় না, তেমনি যোগ-সাধনাকারী ভিক্ষুরও উচিৎ বিশ্রামের জায়গা নিয়ে কোন বাছবিচার না করে মাদুর কিংবা মাটিরূপ যে

কোনো স্থানে শুয়ে পড়া তবে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়া নয়। গর্দভের এই এক গুণ ভিক্ষুর গ্রহণীয়।[1]

২. মুর্গীর পাঁচ গুণঃ- মোরগের কাছ থেকেও একজন ভিক্ষুর শিক্ষণীয় আছে বলে নাগসেন মনে করে থাকেন। মোরগ যেমন যথাসময়ে নিজের কার্য সম্পন্ন করে অর্থাৎ সময় মতো শুয়ে পড়ে এবং সময় মতো জাগ্রত হয়,তেমনি একজন ভিক্ষুর উচিৎ সময় মতো নিজের শারীরিক কার্য (বাত,স্নান) সম্পন্ন করে চৈত্য বন্দনায় বা ধ্যানে নিবিষ্ট হওয়া।আবার খাদ্য গ্রহণে মোরগ যেমন কোন বাছবিচার না করে শুধু মাত্র শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ করে অনুরূপ ভাবে একজন ভিক্ষুরও উচিৎ কেবল মাত্র শরির ধারনের জন্য,ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবৃতির জন্য আহার গ্রহণ করা, তাতে (খাবারে) মত্ত থাকার জন্য নয়।অন্যদিকে চোখ থাকতেও মোরগ যেমন রাত্রিতে অন্ধ্যের মতো বিচরণ করে, যোগসাধনানিরত ভিক্ষুরও অনুরূপ আচরণ করা উচিৎ,যাতে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন লোভনীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়।আবার মোরগ লাঠি দ্বারা তাড়িত হলেও যেমন নিজের গৃহ ত্যাগ করে না,তেমনি একজন ভিক্ষুরও উচিৎ নিজের

[1] মহাস্থবির, ধর্মাধার শ্রীমৎ পণ্ডিত, *মিলিন্দপ্রশ্ন*, বঙ্গানুবাদ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩,পৃ. ৩০৬-৭।

গৃহ কখনো ত্যাগ না করা, এখানে গৃহ বলতে ভিক্ষুর মানসিক তৎপরতাকে বোঝানো হয়েছে।সুতরাং মোরগের এই পাঁচ প্রকার গুণ ভিক্ষুর অবশ্য গ্রহণীয়।[1]

৩. কাঠ বিড়ালের এক গুণঃ- কাঠবিড়ালের নিকট কোনো শত্রু যখন উপস্থিত হয় তখন কাঠবিড়ালী তাঁর আঙ্গুল ও লেজ দ্বারা শত্রুকে বিতাড়িত করে,সেই রুপে ভিক্ষুর মনে ক্লেশরাশির উদয় হলে সেই ক্লেশরাশিকে স্মৃতির উপস্থাপন দ্বারা সমুলে ধ্বংস করা ভিক্ষুর অবশ্য কর্তব্য।[2]

৪. চিতা বাঘিনীর এক গুণঃ- চিতা বাঘিনী একবার মাত্র গর্ভ ধারণ করে পুনরায় আর বাঘের সান্নিধ্যে যায় না।সেরুপ একজন যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর সংকল্প গ্রহণ করা উচিৎ ভবিষ্যতে তিনি যে আর জন্ম গ্রহণ না করে,পুনরায় তিনি যেন দুঃখ-কষ্টের সান্নিধ্যে না আসে।[3]

৫. চিতা বাঘের দুই গুণঃ- প্রথমত চিতা বাঘ যেমন পতিত কোনো পশুকে বা আগে থেকে মেরে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো পশুকে খায় না,তেরমনি একজন ভিক্ষুর আসৎ উপায়ে উপার্জিত খাদ্য,বস্ত্র গ্রহণ করা উচিৎ নয়। দ্বিতীয়ত, চিতাবাঘ গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করে পশুর উপর আক্রমণ করে নিজের আহার জোগার করে সেরূপে একজন ভিক্ষুর উচিৎ নির্জন স্থানে বা অরণ্যে

[1]ঐ,পৃ. ৩০৭-৮।

[2] ঐ,পৃ. ৩০৮-৯।

[3] ঐ,পৃ. ৩০৯।

আত্মগোপন করে ধ্যানে বা যোগসাধনায় নিরত থাকা। কারণ খোলামেলা স্থানে বা শব্দযুক্ত স্থানে ধ্যান করলে সেই ধ্যান ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।চিতা বাঘের এই দুটি বৈশিষ্ট থেকে একজন ভিক্ষুর শিক্ষণীয় আছে।[1]

৬. কচ্ছপের পাঁচ গুণঃ- প্রথমত, কচ্ছপ যেমন জলে বাস করে,তেমনি যোগসাধনাকারী ভিক্ষু সমস্ত মানুষের মঙ্গল চিন্তা করে এই পরিবেশে বাস করবে।দ্বিতীয়ত,কচ্ছপ যখন জলের উপর ভাসে তখন সে তাঁর মাথা বার করে রাখে কারন তা দিয়ে সে নজর রাখে যাতে করে অন্য কেউ তাকে দেখতে না পায়,ঠিক সেরকম যোগসাধনা কারী ভিক্ষু যক্ষন কোন ক্লেশের সম্মুখিন হয় তখন তাকে খেয়াল রাখা উচিৎ সে ক্লেশ যেন তাকে আবদ্ধ করতে না পারে।তৃতীয়ত,কচ্ছপ যেমন প্রয়োজন মতো নিজের শরীরকে জল থেকে তুলে দেহকে তপ্ত করে সেরকম ভিক্ষুরও উচিৎ নিজের উদ্দমকে সবসময় জাগিয়ে রাখা।চতুর্থত,কচ্ছপ যেমন সবসময় একান্তে বসবাস করে তেমনি যোগসাধনাকারী ভিক্ষুকেও প্রসংশা,নিন্দা ইত্যাদি পরিহার করে একান্তে অবস্থান করা কর্তব্য।পঞ্চমত,কচ্ছপের সান্নিধ্যে বাইরে থেকে কোন কিছু যদি কচ্ছপের সান্নিধ্যে এসে পড়ে তাহলে কচ্ছপ নিজেকে বাচানোর জন্য তার আবরণের মধ্যে নিজেকে গোপন করে নেওয়ার চেষ্টা করে,অনুরূপ ভাবে একজন ভিক্ষুও সাধন

[1]. ঐ,পৃ. ৩০৯-১০।

কালে নিজেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সংযত রাখবেন।কচ্ছপের এই পাঁচ প্রকার গুণ হতে একজন ভিক্ষুর শিক্ষণীয় আছে বলে নাগসেন মনে করেন।[1]

৭. কাকের দুই গুণঃ- আমরা জানি কাক যে কোনো স্থানে শঙ্কিত হয়ে বা সাবধানতার সঙ্গে আবস্থান করে এবং যে কোনো খাবার নিজের জাতি ভাইদের সাথে ভাগ করে খায়,অনুরূপ ভাবে একজন ভিক্ষুও সর্বদা সাবধানতার সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে আবস্থান করবে এবং ভিক্ষা পাত্রে যা কিছু দান হিসাবে পাবে তা সকলের সাথে ভাগ করে খাবে।অতএব কাকের এই দুটি বৈশিষ্ট অবশ্য গ্রহনীয়।[2]

৮. বানরের দুই গুণঃ- স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বানর যেমন সবসময় বেশী ডাল-পালা যুক্ত গাছ নির্বাচন করে,যাতে করে কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা না থাকে। তেমনি ভাবে যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর এমন একজন গুরু নির্বাচন করা উচিৎ যিনি যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছেন।আবার বানর যেমন অরণ্যের মধ্যে ঘন শাঁখা সম্পন্ন গাছ নির্বাচন করে সেখানেই বসবাস করে অর্থাৎ সেখানেই উঠে,বসে এবং শুয়ে থাকে তেমনি একজন যোগসাধনা কারী ভিক্ষুর উচিৎ গভীর

[1] ঐ,পৃ. ৩১০-১১।
[2]ঐ,পৃ. ৩১২।

অরণ্য নির্বাচন করে সেখানেই উঠ-বস করা,চলা-ফেরা করা,নিদ্রা যাওয়া এবং ধ্যানে মগ্ন থাকা।[1]

৯. উইপোকার এক গুণঃ- উইপোকা যেমন নিজেকে উপর থেকে আবৃত করে বা নিজেকে গোপন রেখে আহারের জন্য চুপ করে বসে থাকে তেমনি করে যোগসাধনায় নিরত থাকা ভিক্ষুর পক্ষে শীলসংযম দ্বারা নিজের মনকে আবৃত ও সংযত করে ভিক্ষার জন্য গমণ করা উচিৎ।[2]

১০. বিড়ালের দুই গুণঃ- প্রথমত, বিড়াল গুহা,গর্ত ও প্রাসাদের মধ্যে থাকলেও সর্বদা আহারের জন্য ইদুঁরের খোঁজ করে থাকে।অনুরূপ ভাবে একজন ভিক্ষু গ্রাম,অরণ্য কিংবা বৃক্ষমূলের যেখানেই বাস করুক না কে তাঁর পক্ষে সর্বদা অপ্রমাত্তভাবে শারীরিক স্মৃতিরূপ ভোজনের খোঁজ করা উচিৎ।দ্বিতীয়ত, বিড়াল নিজের কাছাকাছি স্থানেই শিকারের সন্ধান করে- দূরে নয়। সেইভাবে একজন ভিক্ষুকেউ ভিক্ষার জন্য কাছাকাছি গ্রামে গমন করা উচিৎ।[3]

---

[1] ঐ,পৃ. ৩১৩।

[2] ঐ,পৃ. ৩২৮।

[3] ঐ,পৃ. ৩২৮।

১১. মূষিকের(ইদুর) এক গুণঃ- মূষিক যেমন সর্বদা আহার সন্ধানী হয়ে এদিক-সেদিকে ছুটোছুটি করে।অনুরূপভাবে একজন ভিক্ষু এদিক-সেদিকে গমণ করলেও জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশকে শীর্ষস্থানে রাকবেন।[1]

১২. বৃশ্চিক বা কাঁকড়াবিছার এক গুণঃ- কাঁকড়াবিছা যেমন তার লেজকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তেমনি একজন ভিক্ষু তাঁর প্রজ্ঞাকে অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাবে।[2]

১৩. নকুল বা বেজির এক গুণঃ- বেজি কোন বিষধর সাপকে ধরতে যাওয়ার সময় নিজের দেহকে আগে নানান ভেষজ বা ঔষধ দ্বারা অনুলিপ্ত করে।সেইরূপে একজন ভিক্ষু যখন কোন ক্রোধী, রাগী,বিদ্বেষ পরায়ন বা হিংস্র ব্যক্তির নিকট উপদেশ করতে যাওয়ার আগে নিজেকে মৈত্রীভাবনারূপ ভেষজ দ্বারা অনুলিপ্ত করা উচিৎ।[3]

১৪. জড়শৃগালের দুই গুণঃ- প্রথমত, জড়শৃগাল কোন আহার খুঁজে পেলে কোনরূপ ঘৃণা না করেই সেই আহার ভোজন করে থাকে। অনুরূপভাবে একজন

---

[1] ঐ,পৃ. ৩২৯।

[2] ঐ।

[3] ঐ।

ভিক্ষুরও উচিৎ ভিক্ষাপাত্রে যা কিছু খাবার দান হিসাবে পাওয়া গেছে তাতে কোনরূপ ঘৃণা না করে আনন্দে ভোজন করা।দ্বিতীয়ত, খাদ্য গ্রহণের সময় শৃগাল সুস্বাদু কিংবা কটু এরূপ কোনরকম বাছবিচার না করে শরীর ধারণের জন্য তা আনন্দে ভোজন করে।সেইভাবে একজন ভিক্ষুরও উচিৎ খাদ্য গ্রহনে কোনরূপ বাছবিচার না করা, কেবল শরীর ধারণের জন্য তা গ্রহণ করা।[1]

১৫. মৃগের দুই গুণঃ- প্রথমত, হরিণ যেমন সারাদিন অরণ্যে অবস্থান করে রাত্রে খোলা কোন স্থানে শয়ন করে। অনুরূপভাবে একজন যোগেনিরত থাকা ভিক্ষু দিনের বেলায় অরণ্যে বাস করিবেন এবং রাত্রিতে খোলা কোন জায়গায় বিচরণ করিবেন। দ্বিতীয়ত, হরিণ শর বা তিরের সম্মুখিন হলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং নিজেকে তিরবিদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে,তেমনি ভাবে একজন ভিক্ষুর চিত্ত ক্লেশরাশির সম্মুখিন হলে সেই ক্লেশরাশিকে পরিহার করা উচিৎ এবং নিজেকে তা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ।[2]

১৬. গরুর চার গুণঃ- প্রথমত, গরু যেমন কখনো নিজের মালিকের গৃহ ত্যাগ করে না তেমনি একজন ভিক্ষুর কখনোই নিজের দেহকে ত্যাগ করা

---

[1]। ঐ,পৃ. ৩৩০।

[2] ঐ,পৃ. ৩৩১।

অনুচিত।দ্বিতীয়ত, যখন কোন গরুকে গাড়ীতে নিযুক্ত করা হয় তখন কষ্ট হলেও গরু সেই গাড়ীকে বহন করে নিয়ে যায়।অনুরূপভাবে সাধনানিরত ভিক্ষু- যিনি একবার যখন প্রব্রজ্যাব্রত গ্রহণ করেছেন তখন তাঁর কষ্ট হলেও যে কোন প্রকারে তাঁকে শেষ জীবন পর্যন্ত প্রাণপনে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিৎ। তৃতীয়ত, গরু যেমন গন্ধশুকে ইচ্ছা অনুসারে জলপান করে তেমনি একজন ভিক্ষুর আচার্য ও উপাধ্যায়ের আদর,যত্ন ও উপদেশকে আঘ্রাণ করে মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করা উচিৎ।চতুর্থত, গরু যেমন যে কারুর দ্বারা গাড়ীতে নিয়োজিত হয়ে তা বহন করে তেমনি ভাবে যোগেনিরত থাকা ভিক্ষুর- প্রবীন,মধ্যম ও নবীন ভিক্ষু বা গৃহী উপাসকদের মধ্যে যে কোন জনের উপদেশ ও অনুশাসন নতশিরে স্বীকার করা উচিৎ।[1]

১৭. শূকরের দুই গুণঃ- প্রথমত, শূকর যেমন গরম কালে নিজের শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য জলের মধ্যে ডুবে থাকে, তেমনি যোগসাধনায় নিরত ভিক্ষুর চিত্ত দ্বেষ ও হিংসা দ্বারা বিধস্ত হলে সেই হিংসাত্মক মনোভাব থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে হলে ভিক্ষুকে সারাক্ষন মৈত্রীভাবনায় ডুবে থাকা উচিৎ। দ্বিতীয়ত, শূকর যেমন কাদা-জলে নাসিকাদ্বারা মাটি খুঁড়ে গর্ত বা ছোটো নৌকাবিশেষ তৈরি করে

[1] ঐ,পৃ. ৩৩১-৩২।

এবং সেখানেই শয়ন করে।সেইরূপ সাধনানিরত ভিক্ষুর মন দেহতে নিবিষ্ট রেখে যে কোন আলম্বন নিয়ে শয়ন করা উচিৎ।[1]

১৮. পায়রার এক গুণঃ- পায়রা যেমন পরের গৃহে বাস করার সময় তাদের দ্রব্যের প্রতি লালসা উৎপন্ন করে না বরং সেই দ্রব্যের প্রতি নিরপেক্ষ ও সংজ্ঞাবহুল হয়ে বাস করে।সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষু গৃহী-কুলে গমন করে সেই কুলের নর-নারী, খাদ্য-বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজনের জন্য ব্যবহৃত জিনিস পত্র প্রভৃতি দেখলেও সেই জিনিসপত্রের প্রতি কোন রূপ লালসা উৎপন্ন করবেন না, বরং তাদের প্রতি অনাশক্ত হয়ে বিচরন করবেন এবং 'আমি শ্রমণ, এই স্মৃতিজ্ঞান সর্বদা স্মরনে রাখবেন।[2]

১৯. সারস পক্ষীর এক গুণঃ- সারস পাখি কোন বিষয় দেখে ভীত হলে উচ্চস্বরে চিৎকার করে ভয়ের বিষয় অপরকে জানিয়ে দেয়।সেইরূপে সাধনানিরত ভিক্ষুর পক্ষেও অপরকে ধর্মোপদেশ করার সময় নরক-যন্ত্রনণা কতটা ভয়ঙ্কর আর নির্বাণ বিষয় কতটা আনন্দদায়ক বা মঙ্গলদায়ক তার তুলনা মূলক আলোচনার দ্বারা উত্তমরূপে প্রদর্শন করা উচিত।[3]

---

[1] ঐ,পৃ. ৩৩২।

[2] ঐ,পৃ. ৩৩৬।

[3] ঐ,পৃ. ৩৩৭।

২০. উলুক বা প্যাঁচার দুই গুণঃ- প্রথমত, প্যাঁচা ও কাঁকের মধ্যে স্বাভাবিক শত্রুতা আছে, যার জন্য প্যাঁচা রাত্রে কাঁকের দলে প্রবেশ করে বহু কাককে হত্যা করে থাকে।সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর অবিদ্যার সহিত শত্রুতা করা উচিত এবং একাকী নির্জন স্থানে উপবিষ্ট থেকে অবিদ্যারূপী শত্রুকে সমূলে বিনাশ বা ছেদন করা উচিত।দ্বিতীয়ত, প্যাঁচা গোপনে চিন্তায় মগ্ন থাকে।সেইরূপে যোগসাধনকারী ভিক্ষুর উচিত নির্জন কোন স্থানে গোপনে ধ্যানে নিমগ্ন থাকা।[1]

২১. বাদুড়ের দুই গুণঃ- প্রথমত, বাদুড় পর গৃহে প্রবেশ করলেও অতিসত্বর সেই গৃহ থেকে বেড়িয়ে আসে, সেখানেই আবদ্ধ থেকে যায় না।সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষু কোন গ্রামে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেও ক্রমান্বয়ে ভিক্ষা করে সেই গ্রাম থেকে ভিক্ষুর বেড়িয়ে পড়া উচিত,সেখানকার কোন কিছুতে জড়িয়ে পরা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, বাদুড় পর গৃহে বাস করার সময় তাদের কারুর ক্ষতি করে না। সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য পরগৃহে উপনিত হওয়ার কালে যদিও ভিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তাহলেও গৃহীর কোনরূপ অনিষ্ট

---

[1] ঐ।.

কামনা করা উচিত নয়,বরং সর্বদা গৃহীদের শ্রীবৃদ্ধি হোক এরূপ কামনা করা উচিত।[1]

২২. জোকের এক গুণঃ- জোক যেখানেই সংলগ্ন হয় সেখানেই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে রক্তপান করে।সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষু চিত্তকে যে বিষয়ে সমাধিস্থ করেছেন সেই বিষয়ের বর্ণ, আকার প্রভৃতিতে চিত্তকে আবদ্ধ রেখে তার মধ্য থেকেই মুক্তিরস পান করা উচিত।

২৩. সাপের তিন গুণঃ- প্রথমত, সাপ বুকের উপর ভর করে গমন করে থাকে।সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর উচিত প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করা, কেননা প্রজ্ঞা দ্বারাই ভাল-মন্দের বিচার হয়ে থাকে।দ্বিতীয়ত, সাপ লতা-পাতা যুক্ত স্থান বর্জন করে গমন করার চেষ্টা করে।সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষুরও উচিত সর্বদা কদাচরণ বা খারাপ আচরণ বর্জন করে গমন করার চেষ্টা করা।তৃতীয়ত, সাপ মানুষদিগকে দেখলে চঞ্চল হয়,ব্যাকুল হয় এবং চিন্তিত হয়।সেইরূপে যোগীর মনে কুচিন্তার উদয় হলে সেই কুচিন্তাকে দূরে সরানোর জন্য ভিক্ষু তৎক্ষণাৎ চঞ্চল বা ব্যাকুল হয়ে পড়বেন এবং ভিক্ষুর

[1]। ঐ,পৃ. ৩৩৮।

মনে চিন্তার উদয় হওয়া উচিত আহা! আমার আজকের দিনটি কি আনন্দে কেটেছে।[1]

২৪. অজগরের এক গুণঃ- অতিবিশালাকার অজগর শরীর ধারণের জন্য যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার খুঁজে পায় না, তখন অপূর্ণ আহারে বহুদিন পর্যন্ত খালি পেটেও শরীর ধারণ করতে পারে। সেইভাবে পরের অন্ন দ্বরা জীবননির্বাহকারী ভিক্ষুর যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিক্ষান্ন লাভ হয় না, তখন ভিক্ষু আত্মসংযমের দ্বারা চার কিংবা পাঁচ গ্রাস কম খেয়েও জীবন নির্বাহ করা উচিত।

২৫. মাকড়সার এক গুণঃ- পথ মাকড়সা রাস্তার মধ্য জাল বিস্তার করে সেখানেই কোন পকা বা মাছির জন্য অপেক্ষা করে।পরে কোন পোকা, মাছি কিংবা পতঙ্গ জালে আবদ্ধ হলে সেই পোকা মাকড়কে ধরে সেখানেই ভক্ষণ করে।সেইরূপে সাধনানিরত ভিক্ষুকে ছয় দ্বারেতে স্মৃতি উপস্থাপন জাল বিস্তার করে রাখা উচিত।পরে যদি কোন দ্বারে কোন ক্লেশরাশি এসে উপস্থিত হয়, তাহলে ওই দ্বারেই সেই ক্লেশরাশিকে ছেদন করা উচিত।[2]

[1] ঐ,পৃ. ৩৩৯।.

[2]ঐ,পৃ. ৩৪১।

শুধু পশুপাখি কিংবা ছোটো কীটপতঙ্গ হতেই নয় গাছ-পালা থেকেও একজন ভিক্ষুর কিছু শেখার আছে বলে নাগসেন মনে করে থাকেন।যেমন-

২৬. বৃক্ষের তিনটি গুণঃ- প্রথমত, বৃক্ষ ফুল ও ফল ধারণ করে। সেইরূপে সাধনানিরত ভিক্ষুর বিমুক্ত কুসুম ও শ্রামণ্য-ফল ধারণ করা উচিত।দ্বিতীয়ত, বৃক্ষ নিজের নিকটে উপবিষ্ট ও আশ্রিত থাকা মানুষদের ছায়া প্রদান করে।সেইরূপ যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর উচিত নিজের নিকটে থাকা জনগণকে ধর্মোপদেশ দান করা।তৃতীয়ত, বৃক্ষ ছায়া দানে কোনরূপ বৈষম্য না করে সকলকে তার ছায়া প্রদান করে থাকে।অনুরূপভাবে যোগে নিরত থাকা ভিক্ষুর সমস্ত জীবের প্রতি বৈষম্য পরিহার করা উচিত।অর্থাৎ চোর, লোভী, শত্রুদের প্রতিও সমান মৈত্রীভাবনা পোষণ করা উচিত,সকলকে ধর্মজ্ঞানে অভিভুত করা উচিত।[1]

২৭. বাঁশের এক গুণ- বাঁশ গাছের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হল বায়ু যেদিক হতে প্রবাহিত হয় সেদিকেই ঝুকিয়া পরা,অন্যত্র নহে। অনুরূপ ভাবে একজন ভিক্ষুর

[1] ঐ,পৃ. ৩৪৩।

কর্তব্য হল ভগবান বুদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য যে মার্গ নির্দেশ করেছেন সেই মার্গে স্থির থেকে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করা।অন্য কনো ভাবে নয়।[1]

২৮. আলাবুলতার এক গুণ- লতাজাতীয় যে কোনো গাছ(লাউ,কুমড়ো) অপর কোনো আলম্বনকে যেমন-খড়,কাঠ ইত্যাদিকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠে এবং আশ্রয়ের সবটাকেই তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে ছেয়ে ফেলে।অনুরূপ ভাবে ভিক্ষুর কর্তব্য হল নিজের মধ্যে বুদ্ধবচনগুলির স্মরণ করার ফলে যে ভাল ধারণা গুলি গড়ে উঠে সেই ধারনা গুলিতে তার মনকে নিবিষ্ট রাখা।[2]

২৯. পদ্মের তিন গুণ- পদ্মের তিনটি বৈশিষ্ট হতে ভিক্ষুর শিক্ষণীয় আছে বলে নাগসেন মনে করেন।এই তিনটি বৈশিষ্ট হল-প্রথমত, পদ্মফুল জলে উৎপন্ন হয়ে জলেই বেড়ে ওঠে আথচ পদ্ম জল দারা লিপ্ত হয় না।অনুরূপ ভাবে একজন ভিক্ষু কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করেছে, কোন সম্মানের অধিকারী ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তায় লিপ্ত থাকা উচিৎ নয়।অর্থাৎ পাঁকে জন্মেও কিভাবে পাঁক মুক্ত রাখা যায় – এই হল পদ্মের প্রথম গুণ।দ্বিতীয়ত, পদ্ম জলে উৎপন্ন হয়েও যেমন জলের উপরে অবস্থান করে তেমনি একজন ভিক্ষু দুঃখময় জগতে জন্ম গ্রহণ করলেও

[1] ঐ,পৃ. ৩১১-১২।

[2] ঐ,পৃ. ৩১৪।

তাকে জাগতিক বা সাংসারিক দুঃখের উচ্চ স্তরে আবস্থান করা উচিৎ। তৃতীয়ত,পদ্ম স্বল্পমাত্র বায়ু দ্বারা তার মৃণাল সঞ্চারিত করে সতেজ থাকে,তেমনি একজন ভিক্ষুকেউ স্বল্প মাত্র ক্লেশের দ্বারা অর্থাৎ অল্পপরিমান খাদ্য,বস্ত্র হতে সংযত হওয়া উচিৎ।[1]

৩০. শাল তরুর এক গুণ-শাল গাচ্ছ যেমন তার কান্ডকে মাটির নিচে শত হাত কিংবা তার থেকেও বেশি গভীরে প্রবেশ করিয়ে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি একজন ভিক্ষুরও উচিৎ শীলের প্রতি মগ্ন থেকে তাঁর চারিত্রিক শুদ্ধতার ব্যাপক প্রসার ঘটানো।[2]

এমনকি নির্জীব বস্তু থেকেও একজন ভিক্ষু নৈতিক গুণাবলীর শিক্ষা নিতে পারে।যেমন-

৩১. সমুদ্রের পাঁচ গুণঃ- প্রথমত, সমুদ্রে কোন মৃত দেহ ফেলে দিলে সমুদ্র তা গ্রহণ করে না,আবার তীরেই ফেরত দিয়ে দেয়।সেইরূপে একজন ভিক্ষুর উচিৎ তার মনের মধ্যে থেকে ক্লেশরূপী রাগ, দ্বেষ, অহংকার, হিংসা প্রভৃতিকে ছুড়ে ফেলা ।দ্বিতীয়ত, সমুদ্রে অনেক দামি দামি রত্ন ধারণ করে থাকে যেমন-

[1] ঐ।

[2] ঐ,পৃ. ৩১৫।

মণি,মুক্তা,শিলা,স্ফটিকমণি প্রভৃতি।আবার সেই সব দামি রত্নকে গোপনে রক্ষা করে বাহিরে নিক্ষেপ করে না।তেমনি একজন যোগসাধনানিরত ভিক্ষুর ধ্যান, মার্গ-ফল,সমাধি,সম্পত্তি ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতির দ্বারা যে সমস্ত গুণবিধি অর্জিত হয়েছে সেগুলিকে গোপনে রক্ষা করা উচিৎ এবং বাহিরে প্রকাশ করা উচিৎ নয়। তীতৃয়ত, সমুদ্র বড় বড় প্রাণীদের নিয়ে একসঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেই বসবাস করে তেমনি একজন ভিক্ষুর সদাচারী,সৎপথ প্রদর্শক,কোমল স্বভাব যুক্ত,অল্পে সন্তুষ্ট,গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও ভাষণে সুদক্ষ বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে বাস করা উচিৎ।চতুর্থত,সমুদ্রে অনেক নদীর জল এসে মিশলেও সমুদ্র যেমন নিজের সীমা কখনো অতিক্রম করে না,তেমনি একজন ভিক্ষুর গ্রহণীয় শিক্ষাপদ সমূহ লঙ্ঘন করা অনুচিত তা লাভ, সৎকার, প্রশংসা,সম্মান বা পূজা প্রভৃতির দ্বারা যাই হোক না কেন।পঞ্চমত, বিভিন্ন নদীর প্রবাহিত জলধারা দ্বারা কিংবা আকাশ থেকে বর্ষিত জলধারা দ্বারা সমুদ্র যেমন কখনো পরিপূর্ণ হয় না তেমনি একজন ভিক্ষুর অর্জিত শিক্ষা দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া উচিৎ নয়।[1]

৩২. পর্বতের পাঁচ গুণঃ- পর্বত কোন জায়গায় গমন করে না একক ভাবে স্থির থাকে।তেমনি সাধনানিরত ভিক্ষুর সম্মান-অসম্মান, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, নিষ্ট-অনিষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে বিচলিত হওয়া অনুচিত।এই সব বিষয়ে ভিক্ষুর

[1] ঐ,পৃ. ৩১৮-১৯।

পর্বতের মত অচঞ্চল ও স্থির থাকাই কাম্য।২. বৃহত্তর পর্বত কারো সাথে সংযুক্ত হয়ে অবস্থান করে না, একক ভাবেই থাকে। সেইরূপে একজন ভিক্ষুর উচিত একক ভাবে নির্জনে গিয়ে যোগসাধনায় নিরত থাকা, কারো সান্নিধ্যে আসা অনুচিত বা কারোর সঙ্গে সংসর্গ করা অনুচিত।৩. পার্বতের উপর যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না তেমনি সাধনানিরত ভিক্ষু তাঁর চিত্তে কোনরূপ ক্লেশরাশির জন্ম হতে দেবেন না।। ৪.পর্বতের চূড়া (শিখর) বিশাল উচুতে উঠে সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করা উচিত। ৫. পর্বত কখনও উন্নত ও অবনত হয় না সেইরূপে যোগসাধনাকারী ভিক্ষুর লাভেতে উন্নত ও অলাভেতে অবনত হওয়া অনুচিত।[1]

[1] ঐ,পৃ. ৩২৩-২৪ ।

উপসংহারঃ-

বৌদ্ধত্রিপিটক বহির্ভূত মিলিন্দপ্রশ্ন নামক গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় পালি সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।এই গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের অনেক জটিল তত্ত্বের সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষন ও নানা উপমা দ্বারা সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।তবে এই বিষয়গুলি গ্রীক রাজা মিলিন্দ ও বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের রীতিতে এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।দেখা যায় রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধদর্শনের জটিল তত্ত্ব বিষয়ে ভিক্ষু নাগসেনকে প্রশ্ন করছেন; নিজের সংশয় ও অজ্ঞানতা দূর করার জন্য।তার কারণ হছে রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে খুবই আগ্রহী ছিলেন।অপরপক্ষে ভিক্ষু নাগসেন প্রত্যেকটি জটিল প্রশ্নের বিশ্লেষণ পূর্বক উত্তর প্রদান করেন। তাছাড়া

এই গ্রন্থটি অনেক উপমার দ্বারা সমৃদ্ধ। যখন এক বা দুটি উপমা তত্ত্বকে বোঝানোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হচ্ছেনা, তখন নাগসেন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্যের জোরে একাধিক উপমা যুক্তি প্রদান করে সফল ভাবে রাজা মিলিন্দের মনের সংশয় দূর করতে সক্ষম হচ্ছেন।এই উপমা যুক্তির বিভিন্নতা নাগসেনের পাণ্ডিত্যকেই প্রমাণ করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোনো সহজ প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাবে না দিয়ে নাগসেন কূটতর্কের আশ্রয় নিয়ে দিছেন।এই ভাবে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মধ্যে সবচেয়ে জটিল এবং দূরহ অভিধম্ম পিটক নাগসেনের দ্বারা এই গ্রন্থে সহজ-সরল ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোটা দাগে আমরা দুটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই।সেই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি হল আধিবিদ্যক ও নৈতিক।আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আত্মা বিষয়ক আলোচনা এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেছে।কেননা এখানে বাস্তব উপমাযুক্তি প্রয়োগ করে দেখানো হচ্ছে যে ব্যক্তি বা আত্মা বলে কিছু নেই, আত্মা একটি নাম মাত্র।এই নামের মধ্য দিয়ে কোন আত্মা বা পুদগলের উপলব্ধি হয় না।পঞ্চস্কন্ধকে আশ্রয় করেই এই নামটি ব্যবহৃত হয় মাত্র।এমনকি ব্যক্তির সাথে এই নামের সম্পর্কটি কীরূপ তারও একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।যার জন্য আত্মা বিষয়ক এরূপ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা পণ্ডিত বর্গের কাছে সমাদরে গৃহীত হয়েছে।এমনকি এই আধিবিদ্যক আলোচনার মধ্যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং আলোচনার বিষয় বস্তুতে

পরিগণিত হয়েছে, যে আলোচনাটা এই গ্রন্থটিকে আরও একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। মহর্ষি গৌতমবুদ্ধ সম্বন্ধে মাঝে মধ্যে যে সংশয়গুলি দেখা দিত সেই সংশয়গুলিকে কীভাবে সামাধান যোগ্য করে তুলা যায় তার একটি ছোটো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই গ্রন্থে। যেমন বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কা, বুদ্ধ সর্বজ্ঞ কিনা, তিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত ছিলেন কিনা,ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আর অন্য কোন পালি গ্রন্থে তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

অপরপক্ষে এই গ্রন্থটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।যে ধারণা গুলিকে না জানলে বৌদ্ধদর্শনের নৈতিকতাকে বোঝাই সম্ভব নয় সেই সমস্ত ধারণার আলোচনা এখানে দৃষ্টান্ত সহকারে করা হয়েছে।যেমন কুশল ধর্ম কি এই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শীল, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, সমাধি, বীর্য এবং প্রজ্ঞা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত কুশলধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন মানুষ তার চারিত্রিক বিকাশ ঘটাতে পারে এবং নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে পারে। তবে এখানে কেবল একজন মানুষ অপর মানুষের প্রতি কিরকম নৈতিক আচরণ করবে তার কথাই বলা হয়নি সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ মনুষ্যেতর প্রাণী এমনকি গাছপালা অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবশের প্রতি কিরকম আচরণ করবে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সেই দিক থেকে দেখলে গ্রন্থটিকে বৌদ্ধ পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্যতম মূল্যবান পরিচায়ক বলে গণ্য করা

যেতে পারে। সেখানে বলা হচ্ছে মানুষই কেবল নৈতিক বিচারের উপাদান হতে পারে এমন নয়, জগতের প্রতিটি বস্তুই নৈতিক বিচারের দাবী রাখে। কারণ প্রতিটি বস্তুরই নিজেস্ব কিছু মূল্য আছে, যার জন্য তারাও স্বাধীন ভাবে বাঁচার অধিকার রাখে।মানুষ যেমন পরিবেশের ক্ষেত্রে মূল্যবান তেমনি মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে শুরু করে উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিও মূল্যবান।কারণ বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয় জাগতিক বস্তুর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নিরিখে। তাই অন্য প্রাণীর ধ্বংশ কামনা করা উচিৎ নয়। এমনকি এই জগতের সমস্ত কিছুই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ।তাই প্রকৃতি থেকে একটা প্রজাতির বিপন্ন হওয়া মানে কিন্তু প্রকৃতির বিপন্নতাকে ডেকে নিয়ে আশা।তবে বৌদ্ধদের কাছে পরিবেশ বলতে কেবল বাহ্য পরিবেশ ছিল না, বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রকার পরিবেশের কথাই তাঁরা স্বীকার করেছেন। আন্তর পরিবেশের উপর এই দর্শনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ আন্তর পরিবেশের শুদ্ধির দ্বারা একদিকে ব্যক্তি যেমন তার চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেন, অপরদিকে তেমনি বাহ্য পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে পারেন।বাইরে থেকে বাহ্য পরিবেশের উন্নতি বা সংরক্ষণের কথা বলা হলেও তার ফল যত না পাওয়া যায়, প্রাকৃতিক বস্তুর ক্ষয় সাধন করার মানসিকতার যদি পরিবর্তন করা যায় তাতে লাভ হয় অনেক বেশি।এখানেই তাদের অভিনবত্ব।

অন্যদিকে মানুষই যে কেবল নৈতিক শিক্ষার শিক্ষক হতে পারে এমন নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীকেও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে দেখা হয়েছে এই গ্রন্থে।যার জন্য তাদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিৎ। যে মূল কারণে প্রকৃতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত বলে মনে করা হয়েছে তা হল-

(ক) প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যে গুণগুলিকে মানুষ অর্জন করলে তারও চারিত্রিক এবং মানসিক উন্নতি ঘটবে।

(খ) আমাদের মধ্যে সেই গুণগুলির বিকাশ ঘটানোর জন্য আমাদের তাই সেই সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুকে গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করা কর্তব্য এবং সেই কারণে তাদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নেওয়া কর্তব্য।

এই দিক থেকে গ্রন্থটি একটি বিশেষত্ব লাভ করেছে।কারণ অন্য সব পরিবেশ নীতিবিদ্যাতেও পরিবেশ সংরক্ষণ, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, মমতা প্রদর্শন ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে কিন্তু কেউই তাদের শিক্ষক হিসাবে দেখার কথা বলেননি।কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে প্রাকৃতিক বস্তু ও জীব জগত থেকে নির্বাণের পথে অগ্রসর হবার শিক্ষা নেবার কথা বলা হয়েছে।এখানেই বৌদ্ধ নৈতিকতার বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব লুকিয়ে আছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বৌদ্ধ

দার্শনিকরা অনুভব করেছিলেন নিজের প্রয়োজনে, নিজেদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির স্বার্থে যেহেতু ঐ পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাওয়া যায় প্রকৃতির কাছ থেকেই।এই ভাবে নিজেদের দর্শনের মূল্য লক্ষ্যের সঙ্গে প্রকৃতির সংরক্ষণের তত্ত্বটিকে যুক্ত করার মধ্যে তাদের বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পেয়েছে।

এই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে পরবর্তী কালের বিভিন্ন বৌদ্ধ নৈতিক ও আধিবিদ্যক গ্রন্থ গুলিতে বিশেষ করে ভাষ্য বা টিপ্পনিতে অনেক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেঁ এই মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থ হতে নাগসেনের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে বৌদ্ধ দার্শনিকদের কাছে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা কতখানি।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Rhys Davids,[1] I.B.Horner[2] এবং অন্যান্যরাও তাদের কাজের মধ্যে এই মিলিন্দপ্রশ্নের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন যেমন – আচার্য বুদ্ধঘোষ কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুটিত করার জন্য বিশেষ করে "বিশুদ্ধিমার্গের" কয়েকটি স্থানে মিলিন্দপ্রশ্নের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন ।বিশুদ্ধিমার্গ হল বুদ্ধঘোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ কাজ, যেখানে কিভাবে চিত্তশুদ্ধি ঘটতে পারে তার ব্যবহারিক নির্দেশ

[1] Q. K. M., Intro, pp, 14-15.

[2] I.B.H., Intro, p, 20.

বা মার্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে[1] এবং এই কাজে তিনি মিলিন্দপ্রশ্নের অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থটি বৌদ্ধসম্প্রদায়ে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথবা বৌদ্ধজগত এই গ্রন্থকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। এ প্রসঙ্গে Rhys Davids বলেন যে, বুদ্ধঘোষ কৃত "বিশুদ্ধিমার্গ" এর সাথে এই গ্রন্থের সাদৃশ্য থাকলেও প্রধানত চিত্তবিশুদ্ধি সম্পাদন রূপ নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে বুদ্ধঘোষ তাঁর গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন । কিন্তু অন্যদিকে *মিলিন্দপ্রশ্ন* গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্বগুলির বিচার বিশ্লেষণ এবং আপাত বিরোধী সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করা বা সেই তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসুর উৎকর্ষতাকে বৃদ্ধি করা।

তবে কেবল আধিবিদ্যক তত্ত্ব বা নৈতিক তত্ত্বের আলোচনাই যে এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা কিন্তু নয়।এই গ্রন্থটিকে যুক্তি পদ্ধতির দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।বৌদ্ধযুক্তি শাস্ত্রে বাদের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।সেই প্রসঙ্গেই মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।এই গ্রন্থের মধ্যে বাদ কীভাবে করতে হয়,

[1] Bhikkhu, Nanamoli, *Path of Purification*, Translated, Buddhist Publication society , Sri Lanka, 1998, Introduction, p. 9.

কোন পদ্ধতিতে করতে হয়, কোন কোন স্থান বাদের পক্ষে অনুপযোগী এবং কোন ব্যক্তির সাথে বাদে নিযুক্ত হওয়া উচিৎ নয় তার একটা স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে।তবে অন্যান্য গ্রন্থেও এই সব বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা করা হয়ে থাকে।যেমন শঙ্কর মিশ্র তাঁর ***বাদি বিনোদ*** গ্রন্থে বলেছেন, যাঁরা কথার নির্ব্বাহক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ, বাক্যশ্রবণাদিপটু, যাঁরা সর্ব্বজন সিদ্ধ অনুভবের আলাপ করেন না এবং কলহ করেন না তাঁরা কথাধিকারী[1]। কিন্তু যাদের সাথে আলোচনায় অংশ নেওয়া হবে তাদের স্বরূপ সম্পর্কে কোথাও কিছু বলা হয়নি, যা এই গ্রন্থের মধ্যে বলা হয়েছে। এই দিক থেকে গ্রন্থটি একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

এই সমস্ত আলোচনা গ্রন্থটিকে একটি পরিপূর্ণ মাত্রা দিয়েছে।যার জন্য-ই হয়তো এই গ্রন্থটিকে পরবর্তী কালে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও এই গ্রন্থের বেশ কিছু উদ্ধৃতাংশ থেকে তৎকালীন প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।প্রথমত, ব্রাহ্মণ সন্তানরা কীভাবে শিক্ষালাভ করতেন তার একটা স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে এই

[1] শর্মা, রত্না দত্ত, *ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান,* ভূমিকা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১ শঙ্কর মিশ্র, বাদি বিনোদ, ১৯১৮, পৃঃ ২।

গ্রন্থে।যেমন ব্রাহ্মণ সোনুত্তর তাঁর সাত বছরের পুত্র নাগসেনের জন্য সহস্র মুদ্রা গুরুদক্ষিণা দিয়ে কোন ব্রাহ্মণ আচার্যকে নিয়োগ করেন; তাঁর উপর পুত্রের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং তাঁকে বলেন আপনি নাগসেনকে বেদ মন্ত্র শিক্ষা দান করুন।ফলে আচার্য তাঁকে বেদ মন্ত্র দান করলেন এবং বালক নাগসেন এক আবৃত্তিতেই ত্রিবেদ হৃদয়ঙ্গম করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।এই উপরে উক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে এটা বোঝা যায় যে, তৎকালীন যুগের ব্রাহ্মণদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল প্রধানত ত্রিবেদের জ্ঞান এবং গুরুকে এই বিদ্যা বা ত্রিবেদ জ্ঞান দানের পূর্বেই গুরুদক্ষিণা দিয়ে দেওয়া হত। অন্যদিকে রাজ কুমারদের শিক্ষার বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে, রাজপুত্রগণের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় হল হস্তি, অশ্ব, রথ, ধনু, অস্ত্র চালনা, লিখন,পঠন-পাঠন ও মন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি। এক্ষেত্রে রাজ পুরোহিতরা কুমারদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন এবং রাজকুমাররা শিক্ষার শেষে রাজ্য অভিষেক হওয়ার পর ইনি আমার শিক্ষা গুরু এই চিন্তা করে আচার্যকে যথোপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এমনকি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু তথ্য নাগসেনের একটি উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে।যেমন- ‘মহারাজ কোন কুশল ধনুর্ধর নিজের শিষ্যগণকে শিক্ষাগৃহে নিয়ে গিয়ে প্রথমত, কত প্রকারের ধনু আছে তা বর্ণনা করে তারপর ধনুককে কীভাবে ধরতে হয়, কীভাবে তাতে তীর রোপণ করতে হয়, কীভাবে মুষ্টি বদ্ধ করতে হয়, কীভাবে

আঙ্গুল নামাতে হয়, কীভাবে পদ স্থাপন করতে হয়, তীর কীভাবে ধরতে হয়, এবং টানতে হয়, কীভাবে তীর সন্ধান করতে হয়, কীভাবে লক্ষ্যভেদ করতে হয় প্রভৃতির শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারপর ঘাস-পাতা দ্বারা কোন মানুষ বা শাবকছানা নির্মিত করে তাতে লক্ষ্যভেদ করার শিক্ষা দেওয়া হত। অপরদিকে প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায় এই গ্রন্থ হতে। কেননা এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।যেমন নাগসেন তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্রের যে শিক্ষণ পদ্ধতির চিত্রটি এখানে উপমার সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সেটি হল 'কোন শল্য চিকিৎসক গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে ধনের দ্বারা বা নিজ সেবা পরিচর্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করে সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন; অর্থাৎ অস্ত্র কীভাবে ধরতে হয়, কিভাবে ছেদন করতে হয়, কিভাবে অস্ত্র প্রবেশ করাতে হয়, কিভাবে অস্ত্র বের করতে হয়, কিভাবে পুঁজ বের করতে হয়, কিভাবে সেই কাঁটা ঘায়ে ওষুধ লাগাতে হয় ইত্যাদি।এই সমস্ত শিক্ষা গুরুর কাছ থেকে একজন শিষ্য গ্রহণ করে পরে সে নিজেই কোন রোগীর চিকিৎসার জন্য উদ্যত হয়।এই উদ্ধৃতাংশ থেকে প্রচীন ভারতেও যে শল্য চিকিৎসা কতটা উন্নতি লাভ করেছিল তার একটা স্পষ্ট ঈগিত পাওয়া যায়।

আবার এই গ্রন্থে সেই যুগের কয়েকটি কঠোর দণ্ডবিধির উল্লেখ রয়েছে।যেমন- যদি কোন লোক প্রাণী হত্যা করে কিংবা চুরি, মিথ্যা বলে অর্থাৎ কোন পাপ কর্ম করে, তাহলে সে পাপ কর্মের জন্য তাকে অবশ্যই কশাঘাত, বেত্রাঘাত, জীবন্ত শূল, গরম তেলে চুবানো এরূপ শাস্তিভোগ করতে হবে। তাছাড়া তৎকালীন নারীদের জীবন সম্বন্ধেও একটা ধারণা লক্ষ্য করা যায়।যেমন সেই সময়ে কন্যাপক্ষকে শুল্ক বা টাকা দিয়ে কন্যা ক্রয় করে বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। কোন এক ব্যক্তি বিবাহের জন্য আগে থেকে টাকা দিয়ে একটি ছোটো বালিকাকে নির্বাচন করে চলে যায়।পরে বালিকাটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে অপর কোন এক ব্যক্তি যদি সেই বালিকাকে পণ বা টাকা দিয়ে বিবাহ করে, অতঃপর প্রথম ব্যক্তি সেখানে হাজির হয়ে সেই কন্যাকে নিজের বলে দাবি করে এবং এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হলে উভয়ই রাজার কাছে বিচারের জন্য দ্বারস্থ হয় এবং বিচারে প্রথম ব্যক্তিটি সাফল্য লাভ করে। সুতরাং এই উপমা থেকে অনুমান করা যায় যে, যুবতী মেয়েদের মত অল্পবয়স্ক বালিকাকে পণ বা টাকা দিয়ে বিবাহের জন্য ক্রয় করা হলেও প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তারা পিতার আশ্রয়ে থাকবে।পরে প্রাপ্তবয়স্ক হলে পণদাতা সেই মেয়েকে বিবাহ করে নিয়ে যেত।এমনকি নাগসেনের মুখনিঃসৃত কয়েকটি উক্তি হতে তৎকালীন যুগের রাজার মন্ত্রীবর্গ সম্বন্ধেও কিছু তথ্য জানা যায়।যেমন এক স্থানে বলা

হয়েছে – রাজসভায় একশত কিংবা দুইশত মন্ত্রী বা অমাত্য থাকলেও এদের মধ্যে কেবল ছ-জনই (আসল) অমাত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে।সেই ছ-জন অমাত্য হল- সেনাপতি, পুরোহিত, বিচারক, কোষাধ্যক্ষ(ভাণ্ডাগারিক), ছত্র গ্রাহক ও খড়্গ গ্রাহক।এরা সকলেই রাজগুণ যুক্ত; অন্যরা অমাত্য হিসাবে গণ্য হয় না।

এই সমস্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব যথা- অধিবিদ্যা সংক্রান্ত, ধর্ম (religion) সংক্রান্ত বা যুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত আলোচিত হয়েছে তেমনি এই গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা শাস্ত্র ও রাজনীতির পরিচয় বহন করে। একই গ্রন্থের এতগুলো দিক থাকায় এই গ্রন্থটি বৌদ্ধসাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Basu, Rabindra Nath, *A Critical Study of The Milindapañha*, Firma KLM (P) Limited, Calcutta, 1978.

2. Batchelor, Martine and Brown, Kerry, *Buddhism and Ecology*, Motilal Banarsidass Publishers, Pvt.Ltd., First Indian Edition, Delhi, 2006.

3. Gonda, J, 'Tarn's Hypothesis on the Origin of the Milindapañha', *Mnemosyne,* Vol. 2, Brill, 1949.

4. Horner, I.B, *Milinda's Questions*, Translated, London, 1969.

5. Law, Bimal Churn, *A History of Pali Literature*, Vol II. Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933.

6. Mandal, Krishna Kumar, 'The science of Medicine and Surgery: A Prime Concern in the Milinda-panha', Journal of Indian Research, Vol. 2, 2014.

7. Rhys Davids, T.W, *The Questions of King Milinda*, Sacred Books of the East, Vol. XXXV., Motilal Banarsidass Publishers, Pvt.Ltd., First Indian Edition, Delhi, 1994.

8. Siderits, Marks, *Buddhism as Philosophy*, Ashgate Publishing Limited, UK, 2007.

9. V, Trenckner, *Milindapañha*, Ed., Pali Text Society, London, 1962.

10. চক্রবর্তী, সোমনাথ, *কথায় কর্মে এথিকস্*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।

11. চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, 'পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ দর্শন', *তত্ত্ব ও প্রয়োগ* , ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বালী, ২০১৭।

12. চৌধুরী, সুকোমল, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ১৯৯৭।

13. মুখোপাধ্যায়, এ, ও আগরওয়াল, এস. পি, *আধুনিক পরিবশবিদ্যা*, পারফেক্ট প্রিন্টেডপ্রসেস, কলিকাতা, ২০০০।

14. মিত্র, মাধবেন্দ্রনাথ, 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিষয়ক একটি দার্শনিক আলোচনা', *তত্ত্ব ও প্রয়োগ* , ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বালী, ২০১৭।

15. মহাস্থবির, ধর্মাধার শ্রীমৎ পণ্ডিত, *মিলিন্দপ্রশ্ন*, বঙ্গানুবাদ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩।

Philosophical Explorations

UGC-Sponsored, One-Day State Level Seminar

organised by

The Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata

~~4th~~ 10th May 2019

This is to certify that Tularam Singha *of* Jadavpur University *presented a paper titled* পরিবেশ চেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রাসঙ্গিকতা *during the One-Day State-level Seminar, "Philosophical Explorations", organised by the Department of Philosophy, Jadavpur University, held on* ~~4th~~ 10th *May, 2019.*

P. Sarkar

Professor Proyash Sarkar

Head of the Department

Maushumi Guha

Dr. Maushumi Guha

Ggoswami

Dr. Gargi Goswami

Coordinators